মৃগ নেই মৃগয়া

মৃগ নেই মৃগয়া

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক : মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা ১২

মুদ্রক : অজয় দাশগুপ্ত
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

মূল্য : ৪'৫০

সূচীপত্র

কুশলকুমারকে

পদ্মপাতায় জল

ভোর হল, লাল গোল সূর্য কে ছুঁড়ে দিয়েছে আকাশে, পুব দিক থেকে, কেউ জানে না এ দিন কেমন করে কাটবে। ভালোয়-ভালোয় যাবে কিনা, কিছু রুজি-রোজগার হবে কিনা, না কি ঘটবে কোনো অমঙ্গল। বউলার বল ছুঁড়ে দিয়েছে, লাল গোল বল, ব্যাটস্‌ম্যান জানে না কী ওটার মতিগতি, কেমন ওটা ব্যবহার করে বসবে। বলের যেন খলের স্বভাব, অন্তরে বিষ মুখে মধু। ভাবল এক, হল আরেক। ভাবল লেগব্রেক, হয়ে দাঁড়াল গুগলি। হাঁকড়াতে গেল প্রাণপণে, ব্যাটের মাঝখানে না লেগে লাগল কোণ ঘেঁষে, খুঁচ করে ক্যাচ উঠে গেল। কিংবা ছোট মার মেরে চালাকি করে ছুটতে গিয়ে রান-আউট হয়ে গেল, যাকে বলে গাড়িচাপা আউট। কে জানে বাস্তায় বেরিয়ে গাড়িচাপা পড়বে না। সমস্ত বেহিসেব। কেউ জানে না, পাবে না হদিস দিতে। আবার কখনো কেউ বলেব তন্তুও দেখেনি, অন্ধের মত ব্যাট ঠেলে দিয়েছে সামনে, তাতেই জ্বলন্ত বাউণ্ডারি। আবার সব ঠিকঠাক, নিবানব্বুইয়ে এসে ঠেকেছে—বাকি এক রান, একটিমাত্র রান করতে পারল না। সারা ঘর লেপে এসে দুয়ারে আছাড়। যে এক রান করতে পারে না সে শূন্য করে। তাই নিরানব্বুই আর শূন্য সমান।

সমস্ত অনিশ্চয়।

তারই জন্যে ভোরবেলা সূর্যপ্রণাম। হে মহাদ্যুতি, দিন যেন ভালো কাটে। কেউ কালী-দুর্গা ভাবে, কেউ ক্রুশ বা ভার্জিন, কেউ বা পীরের দরগা। আকস্মিক বিপদের মুখে যেন না পড়ি। এই বলটা যেন শুভেলাভে পার হই। দেখিস্ অনাথ করিসনে। জানি তোর অপকর্ম. চপি চপি দেখাস যেন জপের মালা ধরেছিস কিন্তু

আসলে তুই হিংস্র শ্বাপদ। যাই করিস, পথে বসাসনে। ভিক্ষের তুল্য দুঃখ নেই, জিরোর তুল্য অপমান নেই।

তাই ক্রিকেটার মাত্রই ধর্মভীরু। বিশ্বাসী, বিনয়ী, এমন কি, হাঁচি-টিকটিকির উপাসক। সে সর্বক্ষণ বোঝে কিছুই তার হাতের মুঠোর মধ্যে নেই। নেই অহংকর্তৃত্বে। মনটি তাই বিশ্বাসস্থলে লাগিয়ে রেখে খোলা হাতে খেলে যাও। এই অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। আর দেখো এ যুদ্ধে যেন কোথাও নীতিচ্যুতি না ঘটে। যদি ঘটে কোনো অসারল্য, ভদ্রতা বা শালীনতার অভাব, যদি কোথাও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা প্রচ্ছন্ন থাকে, অমনি সমাজ বলে বসবে, ইট ইজ নট ক্রিকেট। এ ক্রিকেট নয় এ ক্রুকেড। ইট ইজ নট ক্রিকেটের মত গাল নেই।

আর যখন দেখ তোমারই বলে তোমারই লোক রসগোল্লার মত সহজ ক্যাচটা ফেলে দিয়েছে সাধ্য কি তুমি 'ফিলসফিক্যাল' না হও, শঙ্করাচার্যের কা তব কান্তা না মনে করো। মায়াবাদের সাধনক্ষেত্রও বুঝি এই ক্রিকেটমাঠেই।

তাই যেমন চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং তেমনি চলৎক্রিকেটজীবনম্।

সমস্তই পদ্মপাতায় জল।

কিন্তু এমনও তো হয় যে, মত্তমাতঙ্গ পদ্মবন তছনছ করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড প্রতাপে দোর্দণ্ড মার দিচ্ছে ব্যাটস্‌ম্যান, শাস্ত্র-পুঁথি বা কপিবুকের ধার ধারছে না—তখনই তো শ্লোকের পরের চরণ ফুটে ওঠে। 'চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥' এ সংসারে তাই হব্‌সই স্মরণীয় তাঁর ১৯৭ টেস্ট সেঞ্চুরিতে, ব্র্যাডম্যান স্মরণীয় তাঁর ৪৫২তে, হানিফ স্মরণীয় তাঁর ৪৯৯এ। গোকুলে যে এক দিন গরু চরাত সেই এক দিন মথুরার রাজা হয়ে বসে।

যেন একটি সার্থক রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা, শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥'

এ বছরের মাদ্রাজ টেস্টে মঞ্জরেকার প্রথম ইনিংসে ১০৮

করল। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্যে রান-আউট হয়ে গেল। তা হোক, কিন্তু বম্বে টেস্টে? প্রথম বলেই গোল্লা। এল আর গেল। শুধু যাওয়া আর আসা। তারপর মনে করুন মাদ্রাজ টেস্টের ব্যারিংটন। কেমন স্রোতে ভাসছে। কেমন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, বলের পর বল চলে যাচ্ছে, ঠুকছে না পিটছে না ছোবল-খাবল দিচ্ছে না। ব্যারিংটন বোরিং-টন বা এক টন বোরিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধু টিকে থাকছে, দলের স্বার্থে কালহরণ করছে, লক্ষ্মণের মত ধরে আছে, খাঁচ্ছে না। একেই বলে 'শুধু স্রোতে ভাসা', গা ঢেলে দেওয়া। আর ক্যাচ তুললে যখন সরদেশাই তা ফেলে দিল তাই হল ব্যাটস্ম্যানের 'আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।'

তারপরে আরো আছে।

'শুধু দেখা পাওয়া, ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া।'

ব্যারিংটনের কথাই হোক। নেমেছে প্রথম টেস্টে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। একটা এক করবার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত। প্রথম বল গেল, দ্বিতীয় বল গেল, তৃতীয়টাও ঢোঁক গিলে পার করল কোনোরকমে, লোকে কী বলবে, চতুর্থ বলেই 'খুঁচ'। আর সঙ্গে সঙ্গেই উইকেটকিপারের দস্তানার মধ্যে প্রতিধ্বনি—'খস'। আস্ত হাঁস বা 'ডাক' খেয়ে গেল ব্যারিংটন।

বলটাকে দেখাল কেমন যেন একটু শিথিল একটু উন্মুখ, অমনি লোভ হল স্পর্শ করি। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস কেউটে। একেবারে মর্মদংশন।

তখন কত অনুতাপ। কেন সংযত হলাম না, কেন প্রলুব্ধ হলাম। কেন তাকে তুইয়ে-বুইয়ে ঠাণ্ডা করলাম না, নিজের পথে চলে যেতে দিলাম না। কেন চুম্বন করতে সাধ হল। এখন অপযশের ডালা মাথায় করে তাঁবুতে ফিরে যাও। আর প্যাভি-লিয়নটাকে তখন কত যে দূর মনে হয়, যেন এক মাইলের

পথ, এ পথ যেন হেঁটে শেষ হবার নয়। কত শ্রীকান্ত হয়ে নামা, সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসা।'

একেই বলে 'শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া।'

কিন্তু কী করল টিটমাস? ব্যাবিংটনের আঙুল ভেঙেছে, বম্বে টেস্টে কৃষ্ণশূন্য পাণ্ডবের মত এম সি সি। ভাঙা আসরে ভাঙা তার সব সহচর, প্রাইস লার্টার আর জোনস, ব্যাটে কারুই বিশেষ আমদানি নেই, তাই নিয়ে টিটমাস তিনশো মিনিট টিকে থেকে চুরাশি করলে। নিজের কত রান ছেড়ে দিচ্ছে, কী কৌশলে প্রাইসকে জোন্সকে সরিয়ে রাখছে বলের খপ্পর থেকে। ওভাবের মাথায় রান নিচ্ছে, সবই যেন মন্ত্রবলে। যা ধরছে তাই সোনা হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে 'ভাঙা তরী ধরে পারাবারে ভাসা।'

আর যখন দৈব চরম রসিকতা করে বসে তখন ফের সেই ওভারের মাথায়ই জোন্স রান-আউট হয়ে যায়। 'ভাঙা ভাষায় ভাবের কান্না' ওঠে। শত প্রাণপণ চেষ্টায়ও সুগোল ফল এসে জোটে না।

ক্রিকেটের সমস্তই ক্ষণিকসুন্দর।

এবং জীবন যেমন এই অনিশ্চয়তার জন্যে সুন্দর তেমনি সুন্দর ক্রিকেট। ওরেল বলছে, লাভলি।

কিন্তু এমন কথা কে শুনেছে দুই ইনিংস জড়িয়ে আমিও ৭৩৭, তুমিও ৭৩৭। ক্রিকেটের ইতিহাসে এ এক অলৌকিক কাণ্ড। এবং এ অলৌকিকের স্থান আছে বলেই ক্রিকেট ক্রিকেট।

এটা ঘটেছিল ১৯৬০এ, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট, ব্রিসবেনে। প্রথম টেস্টটা ৭৩৭এ 'টাই'। দ্বিতীয়টা অস্ট্রেলিয়া জিতল, তৃতীয়টা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। চতুর্থটা ড্র। পঞ্চমটাই মোক্ষম খেলা।

সেকেণ্ড ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকে আর গ্রাউট খেলছে—হাতে এখনো দু উইকেট—আর চার রান হলেই অস্ট্রেলিয়া জেতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল্ দুই বলেই বাকি দুটোকে অনায়াসে নিধন

করতে পারে। অন্তত আবার 'টাই' হয়ে যেতে পারে ব্রিসবেনের মত।

কিন্তু হল কী?

একটা বল গ্রাউট এগিয়ে এসে মারল, বল চলে গেল উইকেট-কিপারের পিছনে। দিব্যি ছুটো রান নিয়ে নিল গ্রাউট। কিন্তু ও হরি, বেল যে মাটিতে পড়ে রয়েছে।

কী করে পড়ল?

ছুই আম্পায়ার পরামর্শ করল। গ্রাউটের বল স্ট্যাম্প ছোঁয়নি, না বা উইকেট-কিপাব আলেকজাণ্ডারের হাত, তবে পড়ল কিসে? আইনে বলছে, এক্ষেত্রে, যেখানে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুনো যাচ্ছে না, সেখানে ব্যাটস্‌ম্যানকে ফৌজদারী আসামীর মত 'সন্দেহের ফল' বা 'বেনিফিট অব দি ডাউট' দাও। ডাউটে আউট নেই।

কিন্তু গ্রাউট জানে কী হয়েছে। তাব মারা বল স্টাম্প ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু আম্পয়ার যখন বলছে, নট আউট, তখন তরণী বেয়ে চলো।

ইট ইজ নট ক্রিকেট।

আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি য়্যাপিল করলে না কেন? অস্ট্রেলিয়ার মত উল্লম্ফন ও নর্তনকুন্দন শুরু করলে না কেন? আলেকজাণ্ডার বললে, 'তার কী দরকার ছিল? বেল তো প্রত্যক্ষ মাটিতে পড়ে আছে।'

চরম জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু হব্‌স কী করেছিল?

গ্রেগরির একটা বল খুব আস্তে বেল ছুঁয়ে গেল উইকেট-কিপার ওল্ডফিল্ডের হাতে। দেরি করে বেলটা মাটিতে খসে পড়ল। হাউজ ছ্যাট? কিছু না, নট আউট। মাথা নেড়ে জানাল আম্পায়ার।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন কলিন্‌স কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ড করছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছে হয়তো। হবস তাকে জিজ্ঞেস করলে,

কী হয়েছে? কলিনস্ বললে, বল তোমার বেল আলগোছে ফেলে দিয়ে গেছে।

'তবে আমি যাই।' আম্পায়ার যাই বলুক, হব্‌স প্যাভিলিয়নে ফিরে চলে গেল।

একেই বলে ক্রিকেট। এই মহামহিমান্বিত ব্যবহার।

কিন্তু এ ব্যবহারকে কী বলবে?

পিটার মে হাঁকড়েছে, বল স্কাই হয়েছে, একটা ফিল্ডার ধরে ফেলেছে ক্যাচ। তবে আর কী। আউট। মে কোনোদিকে না তাকিয়ে সটান যাত্রা করেছে প্যাভিলিয়নের দিকে। ও হবি! ফিল্ডার শেষ পর্যন্ত ফেলে দিয়েছে ক্যাচ। গরম বলটা হাতের মধ্যে ঠাণ্ডা করে জমাতে পারেনি, বার কয়েক লাফালাফির পর পড়ে গিয়েছে মাটিতে। কিন্তু বল কুড়িয়ে নিয়ে ফিল্ডার দ্রুত ছুঁড়ে দিয়েছে উইকেটে। মে তখন কোথায়? মাঠ থেকে সে অনেকটা বেরিয়ে গেছে। সে তবে পরিষ্কার রান-আউট।

রান-আউট? ইট ইজ নট ক্রিকেট। মে রান করল কই যে রান-আউট হবে।

আইন নেই কিন্তু এক্ষেত্রে আম্পায়ারের উচিত ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট না দেওয়া, তাঁকে ডেকে এনে ফের খেলতে বলা। একজনের মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে পরাভূত করা শিষ্টাচার নয়। ক্রিকেট নয়। এ যেন অতিথি হয়ে এসে চুরি করে যাওয়া।

কে জানত না-ছুটে মে রান-আউট হবে। আর কে জানত গ্রাউট বৃন্তচ্যুত হয়েও বৃক্ষচ্যুত হবে না।

কেউ জানে না দিন কী ভাবে শেষ হবে। জন্ম তো বুঝি কিন্তু মৃত্যু কে বোঝে? কেউ জানে না কবে কোথার কীভাবে কে আউট হবে?

নইলে কে ভেবেছিল পাটাউডির তরুণ নবাব ভারতের ক্যাপটেন, কোথায় হেঁটে সমুদ্র পার হবে, তা নয়, পর-পর চারটে ইনিংসেই যথাক্রমে ০, ১৮, ১০ ও ০ করে খানাতেই পড়ল খোঁড়া হয়ে। তা,

নিয়তি কেন বাধ্যতে? মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ, সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

কিন্তু দৈবই কি শেষ কথা? পুরুষকার দিয়েই দৈবকে নিরাকরণ করতে হবে। যে উদ্যোগী পুরুষসিংহ তাকেই লক্ষ্মী জয়মাল্য দেয়। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ? সেই তো ক্রিকেট। চুটিয়ে খেলেছি, জিতলেও খেলা হারলেও খেলা—লাভে-অলাভে, জয়ে-অজয়ে সমান ক্রিকেট। ক্রিকেটই তো যোগ আর সমত্বং যোগ উচ্যতে।

একেই বলে ক্রিকেট

'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয় আর যে গরু গাব-গাব করে খায় সে হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।'

একশো সাতাশ মিনিটে মোটে সাতাশ রান। 'সাতাশ হল না কেন একশো সাতাশ?' ওরে মঞ্জু, ফিরে যা তাঁবুতে, হাড়ে বাতাস লাগুক, অমন মাটি কামড়ে পড়ে থাকিস নে। এখন এটা হুমড়ি গড়, মানে, হুমড়ি খেয়ে গড় হয়ে পড়বার সময় নয়, উমরিগর হবার সময়। প্রথম ইনিংসে কেমন খেলে গেল উমরিগর! বাহাত্তর মিনিটে ছত্রিশ রান, আর তার মধ্যে আটটা বাউণ্ডারি। কেমন খেলে গেল পতৌদির নবাব, পঁচিশ বছরের তরুণ 'টাইগার' মনসুর-আলি। একশো আঠারো মিনিটে পঞ্চাশ, তার মধ্যে নটা বাউণ্ডারি। সেই সব ব্যাঘ্রঝম্পের পর এই গজেন্দ্রগমন! বিউগলে শোকের সুর বাজাতে লাগল দর্শকেরা। 'ফিরে চলো আপন ঘরে।'

প্রথম ইনিংসে ভারতের তিনশো আশি রানের উত্তরে ইংলণ্ড মোটে দুশো বারো রান করেছে। ভারত এগিয়ে আছে একশো আটষটি রানে। দুপুর দেড়টা নাগাদ সুরু করল তার দ্বিতীয় ইনিংস। এখন যত পারো পিটিয়ে রান তোলো। তারপর সময় থাকতে ইংলণ্ডকে ডাকো ব্যাট করতে। দেখতেই পাচ্ছ উইকেটে স্পিন ধরেছে, বল পাক খাচ্ছে বেতালে। আবার ডাকবে ডুরানিকে, বোরদেকে, বলা যায় না, ভরাডুবি ইংলণ্ডের।

সেই সংকল্প নিয়েই নামল কণ্ট্রাক্টর আর জয়সীমা। দু'জনে মিলে পঁচিশ মিনিটে বত্রিশ রান করলে। তারপর উনচল্লিশ রানের মাথায় মাত্র এগারো রান করে কণ্ট্রাক্টর আউট হয়ে গেল। এবার সুরু থেকেই কণ্ট্রাক্টর কণ্ট্রাক্ট করে আছে, এক্সপ্যাণ্ড করতে পারল

না। প্রথম ইনিংসেও চব্বিশ মিনিটে মোটে চার রান করে বিদায় নিয়েছে। তারপর পারফিটের টাটকা ক্যাচটা মাটিতে ফেলে দিল। সেই কখন থেকে দর্শকেরা তাকে ছুয়ো করছে, স্বস্তি দিচ্ছে না। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই যে সে এগারো করে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে আর ফিরল না। না ফিরুক, মঞ্জরেকার, তুমি আছ। তুমি একবার প্রাণোচ্ছল হও। দেখাও কাকে বলে ক্রিকেট।'

কিন্তু .এ কী দরিদ্র দশা! কোথায় মারো কাটো লোটো হর-হর ব্যোমব্যোম শুনব, তা নয় ঠুক ঠুক ঠুক। খুকখুকে কাশি হয়েছে ব্যাটের। কোথায় সেই দুর্বার 'চার', সেই দুর্দান্ত তেজ। এ যে গোঁসাইটি হয়ে আছে। আমাদের গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভালো। মুরলীধরের চেয়ে গদাধরকে বেশি পছন্দ।

ছোট্ট নাতি ঠাকুরদাদাকে বললে, দাদা. ও 'স্থুলিত' হয়ে গিয়েছে।

'স্থুলিত' কীরে? ঠাকুরদাদা শাসনের সুর আনল: 'স্থুলিত' আবার হয় নাকি?

'খুব হয়। পীড়িত হয়, আহত হয়, স্থুলিত হতে পারবে না কেন?' বিজ্ঞের মত মুখ করল নাতি: 'দেখছ না সিঙ্গলস পর্যন্ত নিচ্ছে না।'

'আমাদের হাসতে বারণ ছিল, এবার বুঝি ছুটতেও বারণ হয়ে গেল। আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু ড্র করা, জড়দগব হয়ে বসে থাকা।'

এ পাশে ও পাশে সুরু হল খেদোক্তি। এমন ভাবে খেলছে যেন ভারত ঘোরতর বিপদের মুখে। যেন তার চাল-খুঁটি সব উড়ে গিয়েছে, পড়েছে আতান্তরে। কোথায় রাঙা পাল উড়িয়ে এখন চলে যাবে তরতর করে, তা নয়, টালমাটাল করছে যেন সে এখন নোঙর-ছেঁড়া নৌকো। কোথায় মারে-মারে সরগরম করে তুলবে, তা নয়, ধুক পুক ধুক পুক—ঠুক ঠুক ঠুকুং। যেন শেষ শয্যায় শুয়ে মালা ফেরাচ্ছে বৈরাগী।

এই কি ক্রিকেট? এই মঞ্জরেকারই না কানপুরে ছিয়ানব্বই

করে দিল্লিতে একশো উননব্বইয়ে নট-আউট ছিল ? তার তবে আজ এই ছন্নমতি কেন ? সে কি জানে না মার-ছাড়া ব্যাট ভক্তি-ছাড়া ভজনের মতই আলুনি ? সে কি জানে না যার ব্যাটে 'চার'-মার আছে সেই আসলে 'চার্মার'। কোথায় তার সেই ইন্দ্রজাল ? সে কি ঠুঁটো ? সে কি ধরো-লক্ষ্মণ ?

আমরা কি তবে নিজের জন্যে খেলি, দেশের জন্যে খেলি না ? শুধু নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে, দেশকে উজ্জ্বল করবার জন্যে নয় ? যদি অধিনায়ক নির্দেশ দেয় হাত খুলে মারো নিঃসঙ্কোচে, তাতেও কি আমরা অসম্মত ? আর যদি বিপদের মুখে নির্দেশ দেয়, গুটিয়ে যাও, তাহলে কি খেলতে পারি পিটিয়ে ?

আরে, মশাই, এ এলেনের বল, এ ত্বদ্দাড় মেরে খেলা যায় না।

যায় না ? খানিক আগে জয়সীমা যে ছয় মারলে সেও তো এই এলেনের বলেই। আম্পয়ার রঘুনাথ রাও যখন ত্বু হাত তুলে বাউণ্ডারি দেখাল তখন মাঠের চারিদিকে কী উচ্চণ্ড আনন্দ ! সে কি দেখেনি মঞ্জরেকার ?

'দেখেছি।' আমিও দেখাব।' মনে মনে মঞ্জরেকারও এ কথা বলছে একি তখন আমাদের বিশ্বসনীয় ছিল ?

ছিল না। সুতরাং হে মঞ্জরেকার, তুমি দয়া করো, আউট হয়ে ফিরে যাও প্যাভিলিয়নে। কে মোট কত রান করেছে তা ক্রিকেট নয়, কে কতক্ষণ টিকে আছে তাও ক্রিকেট নয়, কে কত দ্রুত রান করতে পেরেছে তার নাম ক্রিকেট।

'লক বল করছেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে', রেডিওতে শোনা যাচ্ছে : 'মঞ্জরেকার খোঁচা মারতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে-বলে হয়নি, তাই বেঁচে গিয়েছেন এ যাত্রা।'

কেঁচে গেলেও আপত্তি চিল না কারু। হায়, দিল্লির সেই আমির কি কলকাতার ফকির হয়ে যাবে ? তাই বুঝি হল। ব্যাটে-বলে না করেও আউট হয়ে গেল মঞ্জরেকার, স্টাম্প আউট। চারদিক

থেকে জয়ধ্বনি উঠল, বাজল জগঝম্প। দলের লোক পড়ে গেলে দর্শকেরা হর্ষবর্ষণ করে এ কখনো দেখিনি। এ বুঝি ফোড়াফাটার উপশম।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিন যতক্ষণ মঞ্জরেকার ফিল্ড করেছে তাকে দর্শকেরা হাততালি দিয়ে টিটকিরি দিয়েছে। হাততালির ভাষাও কখনো কখনো মর্মান্তিক। যা দিয়ে নন্দন, আবার তাই দিয়ে নিন্দন।

কিন্তু এ সব তোমাকে অম্লানে সহ্য করতে হবে। তুমি যে ক্রিকেট খেলতে এসেছ। ক্রিকেট অর্থ যে নির্বিচলের তপস্যা। ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল দিয়ে দিতে পারে কিন্তু তুমি ক্রিকেটার, কোনো কটাক্ষপাতেই তুমি চঞ্চল হতে পারো না। তুমি শান্ত, স্থির, সুগম্ভীর। সহিষ্ণুতার শালীনতার প্রতিমূর্তি।

ক্রিকেটের সঙ্গে যা মেলে তা হচ্ছে এটিকেট।

কিন্তু তাই বলে বিরুদ্ধদলের ব্যাটসম্যানকে নড়িয়ে দেবার জন্যে প্রতি বলের সূচনায় বিউগল বাজানো বা বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগাবার আকূতি ক্রিকেট নয়। ব্যাটসম্যানের মুখে কাঁচ-ঠিকরনো রোদের টুকরো ফেলা তো কিছুতেই নয়। কিন্তু উপায় কী, তুমি ক্রিকেটার, তুমি এক মহৎসাধনে উদ্যত, সমস্ত দৌরাত্ম্য তোমাকে সয়ে যেতে হবে। 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

তারপর হল কী?

যা হবার তাই হল। ক্রিকেট হল। কালকের বেনে আজকের পোদ্দার হয়ে গেল।

শেষ দিনের শেষ ক্যাচ ক্রিকেটের দেবতা তুলে দিল আর কারু নয় মঞ্জরেকারেরই হাতে। মুহূর্তে দশ দিক উন্মথিত করে উঠল উত্তাল জনগর্জন—জয়গর্জন। মঞ্জরেকারকে উত্তপ্ত স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরো, পারো তো কাঁধে তুলে নাও। যে চক্ষুশূল ছিল সেই এখন হৃদয়রঞ্জন হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, একেই বলে ক্রিকেট।

সেই কবে ১৯৫২ সালে একবার জিতেছিল মাদ্রাজে, সে তো সুদূর স্বপ্নের চেয়েও অস্পষ্ট। এবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে, ইডেন উদ্যানে সোনার সবুজের অঢেলে এ জয়দৃশ্য দেখা জীবনের এক বিরল রোমাঞ্চ। এ বুঝি স্বর্গের ঠিকানায়ই হওয়া সম্ভব। কানপুরে দিল্লিতে শুনেছি এমন পিচ তৈরি হয়েছে যা পাঁচ দিনেও নিটুট পাথর। খেলা যদি পাঁচ দিন একটানা না চলে তাহলে টাকার হিসেবে কম পড়ে যাবে তারই জন্যে এই পাথুরেপনা। সেখানে ব্যাটেরই দাপাদাপি, বল প্রায় নিষ্প্রতাপ। কিন্তু স্বর্গে ব্যাটে-বলে সমান-সমান, মার দেওয়া ও মার খাওয়া পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। তাই যে ব্যারিংটন সেঞ্চুরির নিচে কথা কয় না, সে ইডেনে প্রথম পর্বে চৌদ্দ করে বোল্ড আর দ্বিতীয়ে তিন করে কট, আর যে ছোট্ট দেশাই ল্যাজের শেষ প্রান্তে যার স্থান, তার হাতে বিরাটের বিস্তার, এলেনের বলে লং-অনে করল ওভার-বাউণ্ডারি। এ সব আপ্লুত হয়ে দেখবার মত। যে নাকচের দলে সে উনিশ মিনিটে উনত্রিশ রান লুটে নিল এ চোখে না দেখলে কে মেনে নিত ?

কিন্তু এই অপূর্বকে দেখবার জন্যে টিকেট কই।

ক্রিকেটের সঙ্গে কি টিকেটেরও মিল ছিল না? মিল ছিল তো দেশ-জোড়া কেন এই বিক্ষোভ—আয় আয় ক্রিকেট, নাই নাই টিকেট ?

টিকেটের জন্যে কোথায় না গিয়েছি। হিমালয় থেকে লঙ্কা পর্যন্ত বলতে পারেন—তুষারপর্বত থেকে অশোককানন পর্যন্ত। সর্বত্র অসামর্থ্য। ঘুরেছি দপ্তরে-দপ্তরে, পাছে টিকেট চাই কেউ টেবল থেকে মুখ তুলে তাকায়নি চোখের দিকে। প্রার্থনা করে কত অবান্তর লোককে স্ফীতপুচ্ছ হতে দিয়েছি। কিন্তু বুঝেছি, আমাকে দেবে কেন? আমি যে আউট হয়ে গিয়েছি, রিটায়ার করেছি চাকরি থেকে। আর যে আমার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা নেই। আমি এক সাহিত্যিক, ক্রিকেট সম্পর্কে উৎসাহী, শুধু এতেই কি কোনো দাবি চলে? চলে না। ক্রিকেটের মধ্যে জীবনের মূল

তত্ত্বটি নিহিত, তার মধ্যে আছে এক অধ্যাত্ম আনন্দের আস্বাদ এ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিলেও কি কিছু কদর বাড়বে? অসম্ভব।

তাই চলো দাদা, বাড়িতে বসে রেডিও শুনি। অনেক ভালো বাংলা শিখতে পাবি। 'এ মারটি কল্যাণপ্রসূ হয়নি।' 'কার্যকরী ভঙ্গিতে বল ছুঁড়ে মেরেছেন।' 'এ বলটি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ঘুরিয়ে দিয়েছেন সপাটে।' 'এ বল তুঙ্গে উঠেছে।' 'ঝাঁটাপেটা করেছেন আর একেই বলে ঝাড়ু মার।'

কিন্তু মাঠে না গেলে কী করে প্যাভিলিয়ন থেকে ইংরিজি ঘোষণা শুনতাম! আর, আহা, সে কী অনবদ্য অনুবাদ! 'অকেতাবী' মার দেখেছি আর এ শুনলাম বেহিসেবী ইংরিজি। ঢাক ঢোল বন্ধ হল, এবার কুলোর ডুগডুগি শোন।

যে ভাগ্য মঞ্জরেকারের হাতে শেষ ক্যাচ তুলে দিল সেই যোগক্ষেম বহন করে আনল। শুধু পাইয়ে দিল নয়, পৌঁছিয়ে দিল টিকিট।

চতুর্থ দিন দু শো চুয়াত্তর রানে এগিয়ে থেকে ভারত নামল ব্যাট করতে। কতক্ষণ সে ক্রিজে থাকবে কখন নামাবে ইংলণ্ডকে, এখন এই শুধু গবেষণা।

উল বুনছে এ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু তাই বলে দিব্যি ঘুমুবে ঘাড় গুঁজে? দ্বিতীয় পর্বে ইংলণ্ড ধুকধুকুনি সুরু করলে ওরা চারজন তাস বের করবে নাকি?

সিট বদলাবদলি অনেক হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ সুলতার সঙ্গে দেখা। চোখে কালো চশমা, কাঁধে ঝোলানো বাইনাকুলার। ওমা, তুমি এখানে? তুমি কী করতে এসেছ? দেখতে?

হাসল সুলতা। বললে, 'না। দেখাতে।'

ভাবলাম, ফষ্টিনষ্টির যুগ, রঙ্গ করছে মেয়েটা।

বিরক্ত হলাম। প্রশ্ন করলাম: 'গুগলি জানো?'

সুলতা আবার হাসল। বললে, 'জানি। শামুকের ছোট বোন গুগলি।'

'এক হিসেবে ও ঠিকই বলেছে।' স্নলতার মামা জয়দীপ, যিনি আমার বন্ধু, ফোড়ন কাটলেন : 'ব্যাটসম্যান শম্বুকগতি অবলম্বন করলেই এদিক থেকে পাঠাতে হয় গুগলি।'

গুগলির বাংলা হবে কি ছুঁচো বল ?

কিন্তু এ কী, তেরো রান যোগ হতেই এঞ্জিনিয়র এঞ্জিন ওলটালে ? কী সর্বনাশ, মোট রান একশো উনিশেই চলে গেল পতৌদি, চলে গেল ডুরানি ? যে ডুরানি প্রথম ইনিংসে হৃদয়জুড়ানি ছিল, তেতাল্লিশ রান করে, সে এবার এক রানও করতে পারল না ? এই তো খেলার মজা। যে হিরো সে জিরো করবে আর যে শূন্য সে ধুলোমুঠ ধরে সোনামুঠ তুলবে এই তো রস ক্রিকেটের।

উমরিগর এল আর তার সাত রানের মাথায় পারফিট তার ক্যাচ ছেড়ে দিল।

কী হত না জানি এই ক্যাচ ধরলে। চমকে উঠল স্নুলতা।

স্নুলতাকেই সত্যি দেখাতেই আনা হয়েছে। কানে-কানে বললেন তার মামা। জু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল পুরানো হয়ে গিয়েছে, আধুনিক পাত্র খেলার মাঠে নবীন পরিবেশে দেখতে চায় পাত্রীকে। সেই খাতিরে তাকে একখানা বিয়াল্লিশ টাকার টিকিট জোগাড় করে দিতে হয়েছে। খেলা দেখতে দেখতে সে বেঁধে নেবে খেলাঘর।

'ও সব কী শুনছ, বোরদের মার দেখ।'

বোরদে একদিন 'ছোড় দে' ছিল এখন 'দৌড় দে' হয়েছে।

তারপর দেশাইয়ের ছয়। ডাকাতে মার, উৎপেতে হুঙ্কার।

যখন লাঞ্চ হল তখন ভারত আট উইকেটে দুশো তেত্রিশ। চারশো এক রানে অগ্রসর। সবাই বলাবলি করছি লাঞ্চের পরেই উমরিগর ডিক্লেয়ার করে দেবে। বাকি দেড় দিনে ঘায়েল করবে ইংলণ্ডকে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে, আরো আগেই দান ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, দেড় দিন পর্যাপ্ত হবে না।

কিন্তু কী যন্ত্রণা, লাঞ্চের শেষেও ভারতের হাতে ব্যাট। সবাই শোকম্লান, হাতের লক্ষ্মীকে বুঝি ঠেলে দিল পায়ে। পারের কর্তা বুঝি চরণতরী সরিয়ে নিলেন।

দেশাই গেল তো রঞ্জনেকে পাঠাল। পাঠাল মেহেরাকে। হাতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে তবু সে রেহাই পেল না। কত যেন রানের আকাল পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বোরদে আউট হয়ে ভারমোচন করলে। লাঞ্চের পর চল্লিশ মিনিটে মাত্র উনিশ রান। এই উনিশ রান না হলে কী এমন অশুদ্ধ হত ভাগবত। কিন্তু চল্লিশ মিনিটের অপচয় দারুণ ক্ষতি। পশ্চাত্তাপ না করতে হয়।

মোট দুশো বাহান্ন রান করে ভারত চারশো কুড়ি রানে এগিয়ে আছে। হায় হায় এখানেও ফোর-টুয়েনটির সঙ্গে পারবে কি ইংলণ্ড ?

দেয়ালে পিঠ রেখে বদ্ধপরিকর হয়ে খেলবে ইংলণ্ড। প্রাণপণ চেষ্টা করবে ড্র করতে। যদি পারে, মুখে যতই হুতাশ করি, মনে মনে বলব, বাহাদুর।

কিন্তু কুড়ি রানের মাথায় রাসেলকে নিয়ে নিল রঞ্জানে। প্রথম পর্বেও রঞ্জানেরই শিকার ছিল রাসেল।

এল ব্যারিংটন। কত রঙ্গ করেছে দর্শকদের সঙ্গে। বিউগল বাজালেই য়্যাবাউট টার্ন করেছে। বল ধরলেই হাত ঝেড়েছে, যেন কত লেগেছে হাতে। ছুটতে গেলেই ভাব করেছে যেন পা ভেঙেছে। দর্শকদের দিকে এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছে যেন এটা সার্কাস হচ্ছে আর সে সেখানকার এক ক্লাউন। মনে তার বিশ্বাস জ্বলন্ত ব্যাট ঘুরিয়ে সমস্ত বৈসাদৃশ্য সে শোধন করবে। ক্রিজে আসতে না আসতেই দর্শকদের মজার জন্যে এমন ভঙ্গি করল যেন সে আউট হয়ে গেছে, ফিরে চলেছে প্যাভিলিয়নে। তখনো তার বিশ্বাস সে ব্যাটে ঘোড়দৌড় করবে।

নিশ্বাসেও বিশ্বাস নেই! ক্রিকেটে প্রত্যেকটি বল নতুন। প্রত্যেকটি বলে নতুন জগৎ নতুন সম্ভাবনা। নতুন কলম্বস নতুন

আমেরিকা। দেশাইয়ের বলে ডুরানির হাতে সে হৃদয়জুড়ানি ক্যাচ দিলে। তখন তার রান, ভাবতে পারো, মোটে তিন! একেই বলে ক্রিকেট।

এল ডেক্সটার। নিবাত দীপশিখার মত নিষ্কম্প। সমস্ত মাঠ আলো করে দাঁড়াল। কার সাধ্য তাকে হটায়, প্রলুব্ধ করে। বীতরাগভয়ক্রোধ নিয়তব্রত পুরুষ। দেখে কার না আনন্দ হয়েছে! তার সতেজ ব্যক্তিত্বকে কে না প্রশংসা করবে, তার সহজ যোগ-স্থিতিকে।

কিন্তু ক্রিকেট ক্রিকেট। পঞ্চম দিনে মাত্র এক রান করে, মোট বাষট্টি রানের মাথায় এল-বি হল ডেক্সটার।

ডেক্সটার গেল তো মারের জুটি পারফিট আব নাইট রইল মাটি কামড়ে। লাঞ্চটাইম প্রায় ধবো ধরো, আউট হবার নাম নেই। পাথরে ঘুন ধবে যাবার অবস্থা। তবে কি ম্যাচ বাঁচিয়ে দিল ইংল্যাণ্ড? চল্লিশ মিনিটের অপচয়ের শোধ নেবে দেবতা?

ছড়া কাটছে ছোটরা। 'রঘুনাথ রাও, হাতটি বাড়াও।' কী তখন থেকে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আছ, এমন কী শীত, হাতটি বার কবে তর্জনী তুলে ধবো, পাবফিট ফরফিট হয়ে যাক কিংবা নাইট ফ্লাইট দিক।

নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। শেষ পর্যন্ত জিতে না যায় ইংলণ্ড!

ক্রিকেট আবার ক্রিকেট হল। লাঞ্চের ঠিক আগের বলে আউট হল পারফিট।

তারপব লাঞ্চেব পর দেখতে দেখতে পড়ে গেল বাকির দল।

বোরদে প্রথম পর্বে নিজেব দোষে গাড়িচাপা পড়েছিল মানে রান আউট হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বে দেশাই গুলিছোঁড়া রান আউট করল লককে।

তারপর ডি আর স্মিথের শেষ ক্যাচ প্রাণরঞ্জন মঞ্জরেকারের হাতে।

ভাগ্যিস টিকিট পেয়েছিলাম, দেখতে পেলাম রণবিজয়ের দুর্মদ সুখ।

সুলতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পাত্র এল দেখতে?'

জয়দীপ বললে, 'কই ছোকরাকে দেখতে পেলাম না। বোধ হয় আসেইনি মাঠে। টিকিট ব্ল্যাকমার্কেট করেছে।'

সুলতা হাসল। বললে, 'ব্যাটে-বলে হয়নি, বেঁচে গেছি এ যাত্রা।'

কিন্তু আগুনে-বারুদে হয়েছে, প্রত্যাশার সঙ্গে মিলেছে প্রতিজ্ঞা। স্বপ্নশক্তির সঙ্গে গঠনশক্তি। জয় আর কে দূরে রাখে।

কলকাতার মাঠে ১৯১১ সালের মোহনবাগানের শীল্ড পাওয়া দেখিনি। কিন্তু সেই আনন্দের স্পর্শ আজ ১৯৬২ সালের টেস্ট জয়ে। রাবার বুঝি এবার তবে হাতে এল। ভাগ্যিস আয়ু পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম টিকিট কিনতে।

বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে

ওরা হাততালি দিচ্ছে কেন ?

ওভারটা মেডেন গেল।

সে আবার কী ? মেয়ে পুরুষ কত আনাড়ি আকাট আসে খেলা দেখতে, একজন জিজ্ঞেস করলে।

বললাম, কুমারী ওভার। না না, কুমারী শেষ হয়ে যায়নি, কুমারী অটুট আছে। অর্থাৎ কিনা এই ওভারে কোনো রান নিতে পারল না। বলগুলি অনাহত রইল। বলতে পারো অনাঘ্রাত রইল। ছটা বল দিয়ে একটা মালা গাঁথা হল, কিন্তু গলায় তা নিতে পারল না ব্যাটসম্যান।

আর বলকে যদি ফুল বলো, তা হলে কুমারী ওভার একটি অনাঘ্রাত ফুলের অপরিহিত মালা।

তার মানেই এই ওভারটা ফাঁকা গেল, রান হল না। জলের মত প্রাঞ্জল হলাম : 'তাই এই হাততালি বউলারের জন্যে।'

'মোটেই তা নয়।' ওপাশ থেকে কে আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল : 'এ হাততালি ব্যাটসম্যানের জন্যে। ব্যাটসম্যান যে এই ওভারটা টিঁকে থাকল, টিঁকে থাকতে পারল, তার জন্যে।'

ব্যাটসম্যান কে ? আনাড়ি জিজ্ঞেস করল চুপি চুপি।

তুমি ব্যাটসম্যানও চেন না ? স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখ নামের পাশে লাল আলো জ্বলছে। দেখেছ ? কে ব্যাটসম্যান ?

পাটাউডির নবাব।

হ্যাঁ, ভারতের ব্যাটসম্যান। মাঠে ব্যাট হাতে নামল, বিষণ্ণ, নির্জীব। ছিন্নভুজস্কন্ধ। দুরু-দুরু বুকে খানিকক্ষণ ঠুকঠুক করে

উইলসনের বলে বিক্সের হাতে কট-বিহাইণ্ড হয়ে গেল। তবু এবার শূন্য করেনি। দুই করেছে।

আর বলিহারি বিক্সকে। এতটুকু 'ব্লিঙ্ক' করল না। পাঁচ-পাঁচটা ক্যাচ ধরে পঞ্চমুণ্ডীর আসন পাতল শ্মশানে। জয়সীমা কুন্দরাম সরদেশাই পাটাউডি আর দুরানী। শ্মশান ছাড়া আর কী। আট উইকেটে ভারতের একশো উনসত্তর। এ যে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি।

পাটাউডি যখন এক রান করল তখন কী হাততালি, শূন্যের হাত থেকে বেঁচেছে। শনির দৃষ্টি পড়লে পোড়া শোল মাছটাও পালায়। এবার, পঞ্চমবারও, সে ব্যর্থ হল। কিন্তু আগের নবাব ইফতিকার আলি খাঁর কথা মনে করো। সিডনিতে ইংলণ্ডের হয়ে প্রথম টেস্টে একশো দুই করল। 'ব্যারাকার'-এর দেশ অস্ট্রেলিয়া, নবাবকে 'প্যাট' বলে বিরক্ত করতে লাগল। নবাবের হাসিমুখ, প্যাট তো আদরের ডাক। তখন তাকে বলতে শুরু করল 'পোটেটো'। নবাবের তখনো গোল-আলুর মত হাসি। যে মনসুর আলি মাদ্রাজে ১৯৬১-তে একশো তিন করেছিল, তার মুখে কবে আবার সেই পুরোনো পুঁথি পড়তে পাব?

প্রথম আধ ঘণ্টায় ছত্রিশ রান, এক ঘণ্টায় একষট্টি। কত আশাবন্ধ, কত সমুৎকণ্ঠা, ভারতের জয়জয়কার হাজার কণ্ঠে ঝিলিক দেবে। প্রথমে জয়সীমা আর খানিক পরেই কুন্দরাম বিদায় নিল প্রাইসের বলে, একই দুর্বার মার মারতে গিয়ে। আর দুজনেই উত্তরশিয়রে। মঞ্জরেকার আবার এত অমোঘবিক্রম যে প্রাইসের বলে প্রাইসের হাতেই মারা পড়ল। বোরদে এসে তোলপাড় করলে, টিটমাসের এক ওভারে চার-চারটে বাউণ্ডারি মারলে। কিন্তু ও হরি, একুশ করেই লীলাসংবরণ।

বোরদে—দৌড় দে। এই মিলটা ক্রিকেট মাঠে বহুদিন থেকে চালু। কিন্তু দৌড় না দিয়ে সে যে-এত শিগগির দোর দিয়ে বসবে তা কে জানত।

সরদেশাই বেশ খেলছিল আস্তে-সুস্থে, সকলের আশা সেই আসর জমিয়ে রাখবে। মাইক স্মিথ তাকে দু দুবার ড্রপ করলে—কই তখন নবজীবনে হৈ-হৈ করে খেলবে, তা নয়, দেশাইকে রেখে নিজে সে সরে দাঁড়াল। আর দেশাইকেও বলিহারি, ব্যাটের বদলে পা দিয়ে বল ঠুকে টে সে গেল।

দুরানি এই ইডেন গার্ডেনে গত বছর হৃদয়জুড়ানি ছিল, এবার এ পর্যন্ত হৃদয়পুড়ানি হয়ে রইল। সবচেয়ে ফুর্তি করে গেল স্ফূর্তি। প্রাইসের বলে চুরমার হয়ে গেল হাড়গোড়। ওই একমাত্র শূন্য। একমাত্র বোল্ড।

'কোন শূন্য হতে এল কার বারতা ?'

যেন কারুরই মেরুদণ্ড নেই। সবাই কেমন ভ্রষ্টশ্রী, হতপ্রভ। কেউই সত্যপ্রতিজ্ঞ নয়। বলে বীর্যে বুদ্ধিতে দৃঢ়োদাত্ত নয়।

প্রাইসের চড়া দাম দিতে দিতে সবাই ফতুর হয়ে গেল।

ভাবুন কী অবস্থা !

এল চন্দ্রশেখর। যে বম্বের টেস্টে লার্টারের প্রথম বলেই ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল মাঠ থেকে।

চলো বাড়ি যাই। চন্দ্রশেখরের আসা বালিতে লাঙল চষা।

ব্যাটটা এমনভাবে দোলাচ্ছে নাচাচ্ছে যেন এটা ওর বেড়াবার ছড়ি। কেউ বললে বোধ হয় ভেবেছে ডাণ্ডাগুলি খেলতে হবে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর অসাধ্যসাধন করল।

পনসফোর্ডকে মনে আছে ? পৃথিবীতে শুধু ছবার চারশোর বেশি রান করা হয়েছে এ পর্যন্ত। হানিফ ৪৯৯, ব্র্যাডম্যান ৪৫২ নট আউট, নিম্বলকার ৪৪৩ নট আউট, ম্যাকলারেন ৪২৪ আর পনসফোর্ড দুবার—৪৩৭ আর ৪২৯। সেই রেকর্ড-ভাঙা রানের পর পনসফোর্ড এসেছে খেলতে, সিডনিতে। বিজ্ঞাপন দিয়েছে : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে ব্যাট করতে দেখে যাও। প্রায় সত্তর-আশি হাজার লোক ভেঙে পড়ল মাঠে। সে কী বিশাল
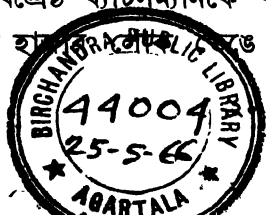
ভয়াল উত্তেজনা! পনসফোর্ড প্রথম ইনিংসে করল ছয়, দ্বিতীয় ইনিংসে দুই।

ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দলের ক্যাপটেন হয়ে এম সি সি'র বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে, তার ক্রিকেটজীবনের থেকে বিদায় নেবার তেরো বছর পর। তার ব্যাটে এখনো না জানি কত রান, শুষ্ক কাষ্ঠেও না জানি কী দুর্ধর্ষ আগুন, হাজার হাজার লোক দেখতে এল সেই বিদ্যুৎগর্জিত বহুবলশালী প্রভঞ্জনকে। একটা বাউণ্ডারি মেরেই স্ট্যাথামের ষষ্ঠ বলেই আউট হয়ে গেল।

কিন্তু চন্দ্রশেখর, যে রসগোল্লার খদ্দের, সে যে তিন-তিনটে বাউণ্ডারি করেও নট-আউট।

চন্দ্রশেখর যখন এল তখন নয় উইকেটে একশো নব্বুই। নাদকার্নি তার হাতে ব্যাট রাখতে চাইছে যেহেতু চন্দ্রশেখর অনাথ অবোধ, ব্যাটে-বলে একত্র করতে পারে না।

কিন্তু কী সাহস, কী স্থৈর্য ঐ সতেরো বছরের কিশোরের, ধীরে ধীরে কী করে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে, কে জানে, হয়তো বা ভারতবর্ষকে।

ক্রিকেট খেলার মাঠে অনেক অনেক স্তব্ধতা নামে। ধূসর বিবর্ণ স্তব্ধতা। চন্দ্রশেখর যখন প্রথম ব্যাট নিয়ে বউলারকে সম্ভাষণ করতে গেল তখনো সেই স্তব্ধতা আরেকবার স্পর্শ করলাম। এই এখুনি পড়ল বুঝি শেষ নিশ্বাস!

একটা বল ঠেকায়, হাততালি পড়ে। একটা বল ছেড়ে দেয়, তখনো হাততালি। তারপর যখন রান করে বসল, তখন তো হস্তে-কণ্ঠে উত্তাল উল্লাস। বেজে ওঠে বিউগল। এর পরে আবার দিল্লির টেস্ট। দিল্লি চলো।

সমস্ত শত্রুশিবির বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এল লার্টার, নাইট, প্রাইস, উইলসন—ছলনাময় টিটমাস। চন্দ্রশেখরের ধ্যান ভাঙতে

পারল না। দেখাল কাকে বলে অকুতোভয়তা। কাকে বলে বজ্রসার সঙ্কল্প। কাকে ব'লে নিরুত্থান তপস্যা।

জিরে চেয়ে হীরে পেয়ে গেলাম।

এ হীরে ক্রিকেটই দিতে পারে।

তাই দিনের শেষেও চন্দ্রশেখর নটআউট। নয় উইকেটে দুশো তিরিশ।

কাল যা ঘটে ঘটুক, আজ তো চন্দ্রশেখরের বাউণ্ডারি দেখি। চন্দ্রশেখরই তো খেলাটাতে টেস্টের আস্বাদ এনেছে।

তাই আর সকলের বাউণ্ডারি বাউণ্ডারি পর্যন্ত, চন্দ্রশেখরের বাউণ্ডারি বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে।

আগুন ব্যাটে নয়, বাঁশে

একটা বৈজ্ঞানিক খেলার অবৈজ্ঞানিক আরম্ভ—টস। টস করে ঠিক করো মার নেবে না মাঠ নেবে। অর্থাৎ ব্যাট করবে না ফিল্ড করবে। এই টসের উপর খেলার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে। খেলায় যখন এত বিজ্ঞানের কারুকলা সেখানে ফলাফল নির্ণয়ে একটা কিনা অশালীন কৌশল। মুদ্রা নিক্ষেপ। বলো মুড়ো না ল্যাজা। সম্মুখ না পশ্চাৎ। অমা না পৌর্ণমাসী।

কিন্তু ভেবে দেখলাম এ একটা সুস্থ ব্যবস্থা। টস করে আরো অনেক কিছু নির্ণয় করে নিলে হয়। পরীক্ষায় পাশ না ফেল, মামলায় ডিক্রি না ডিসমিস, ভোটে ধুলোমুঠ না সোনামুঠ। এ ব্যবস্থায় সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলার চূড়ান্ত অবসান হয়ে যেত। লেখা-পড়ায় কী দারুন হাঙ্গামা, আদালতে কী বিস্তীর্ণ ফিরিস্তি, ইলেকশানে কী প্রচণ্ড গলাবাজি। সব একটা টসেই শান্ত-শীতল হয়ে যেত। জীবন হয়ে উঠত সুখসুন্দর।

ভাবছিলাম যেমন শুরুতে তেমনি ক্রিকেট ম্যাচের শেষ সন্ধ্যায় আরেকটা টস হলেই ঠিক হত। সেই টসে চূড়ান্ত বিচার হত, কে জিতল, কে হারল। নইলে দীর্ঘ পাঁচ দিনে কোনো স্থির সিদ্ধান্তেই তো পৌঁছুনো যাচ্ছে না—যেমন নমুনা—যাবেও না কোনো দিন। তাই বলছি দীর্ঘ পাঁচ দিন দু দলের খেলোয়াড়রা কতক্ষণ করে মাঠে ছুটোছুটি লাফালাফি লোফালুফি করল। খেল-দেল, মেলা-মেশা ফুর্তি-ফার্তা করল, তারপর শেষ সন্ধ্যায় দুই কাপ্তেনে আবার টস হল, মুণ্ড না পুচ্ছ, জিত না হার। এপিঠ না ওপিঠ ?

যে ব্যবস্থা সূচনায় ভদ্র ও সভ্য, অন্তে তা অন্তত সমীচীন হবে না কেন ? নইলে খেলা যে অফলা। চিরন্তন ড্র।

কাউড্রেও কি এসেছে খেলা ড্র করতে? সেও কি শুধু কাঁথা সেলাই করবে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে থেকে তার শুধু দু-হাতে-গোনা-যায় সামান্য কটা রান? অবশ্য তার মারের জাত ভালো, বাউণ্ডারিগুলো পরমসুষম, কিন্তু মারে কই সেই তাপ ও তড়িৎ, সেই আলোক-আনন্দ? একটা কাঠঠোকরা পাখি হয়ে সেও শুধু নীরস ঠোকর দিয়ে চলেছে।

যেন এতটুকুও ভুল করবে না, ঝুঁকি নেবে না, গরুর গাড়ির নিক ছাড়বে না এ সর্বস্বপণ করেই যেন সে মাঠে নেমেছে। তাতে রান হোক বা না হোক। সাংখ্যের যুগ অনেক দিন চলে গিয়েছে, এটা সংখ্যার যুগ। কে মোট কত রান করল, কটা সেঞ্চুরি ব্যাগে পুরল তারই শুধু হিসেব নেওয়া হবে। কে কত মিনিটে কত রান করল তার হিসেব মনে রাখবে না। ব্রাইট খেলল না ডাল্ খেলল, অর্থাৎ কিনা প্রদীপ্ত খেলল, না স্তিমিত খেলল, সে সব মানুষে ভুলে যাবে, শুধু মনে রাখবে কাউড্রে সেঞ্চুরি করে রুগ্ন ভগ্ন বিপন্ন ইংলণ্ডকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ব্রিটিশের সাম্রাজ্যও গিয়েছে, ক্রিকেটও গিয়েছে।

বসে থাকতে থাকতে সর্বশরীরে ব্যাথা ধরে যায়, ইংলণ্ডের এমন হতচ্ছাড়া ব্যাটিং এর আগে কোনোদিন দেখিনি।

কে আউট করবে কাউড্রেকে? যে জেগে জেগে ঘুমুবে তার ঘুম ভাঙানো যাবে কী করে? যে কোটর থেকে বহির্ভূতই হবে না তার জন্যে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে থাকা বিনিষ্ফল।

নাদকার্নি বোরদে দুরানি সুর্তি চন্দ্রশেখর সকলে ব্যর্থকাম। কাউড্রের ভ্রম নেই প্রমাদ নেই অসহিষ্ণুতা নেই। কখন একটা শিথিলহ্রস্ব বল আসবে, পাঠানো যাবে বসতিহীন প্রদেশে, তারই আশায় বসে ঝিমুচ্ছে।

কে আউট করবে কাউড্রেকে?

কেউ-কেউ বলছিল, সেই নেট-প্র্যাকটিসের জীবন ডাক্তারকে ডেকে আনো। যে গাত্র মর্দন করে ব্যাথা সারায় সে ডাক্তার নয় তো কী।

জীবন যদি আউট করতে পারে, তবে এবার তাকে ইণ্ডিয়া পুরস্কার দেবে। সামান্য টাকা নয়, কোনো একটা পদ্ম-পদবী উপহার দেবে।

তারই জন্যে শেষ পর্যন্ত আগুন লাগল। যে আগুন মাঠে দেখা গেল না, তাই দেখা দিল প্যাণ্ডেলে। ব্যাটে নয়, বাঁশে আগুন।

নিষ্প্রাণ ব্যাটিংএর বিরুদ্ধে দর্শকেরা হাততালি দিয়ে ব্যারাক করছিল। তাতে আবার গোসা। মাইকে ঘোষণা করা হল, দয়া করে গোলমাল করবেন না। করলে উইকেট কিপারের হাতে ক্যাচ-বিহাইণ্ডের শব্দ শুনতে পাবে না আম্পায়ার। শুনুন কথা! কালা আম্পায়ার দিয়ে কাজ সারা। গোলমাল করব না তো ব্যাটে-বলে সোরগোল তোলো। খেতে না দিয়ে দীর্ঘকাল পাতের সামনে বসিয়ে রাখলে কার না মেজাজ তিরিক্ষি হয়! তবু তো এখনো বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে সেই সমবেত মন্ত্র উচ্চারিত হয়নি। যদি বাম্পার-বীমার সহ্য হয় তবে এই সব স্তব-স্তুতি বা অভিনন্দনের ধ্বনিও মার্জনীয়।

প্রথম দিন ইণ্ডিয়ার ব্যাটিংএর মধ্যে একটা কুকুর ঢুকেছিল। পুলিস এল তাড়া করে। কেউ কেউ বললে, পুলিস পারবে না, মিলিটারি ডাকো। সেই কুকুরটা আজ কোথায় গেল! সেটাই তো ইণ্ডিয়ার ব্যাটিংএ ফাটল ধরাল। আজ ওটাকে ধরে বেঁধে এনে নামিয়ে দিলে মন্দ হত না।

অনেকক্ষণ একটা চিল উড়ল মাঠের উপর দিয়ে। অলক্ষণ ডাকল একটা কাক। মনে হল এবার বুঝি পড়বে। কিন্তু কাউড্রে নির্বিকার আর তার সাকরেদ পার্কসও দ্যুতিহীন। আবেগ নেই, আকূতি নেই, আগ্রহও নেই।

তাই টসের কথা যা বলছিলাম, টস করেই নিষ্পত্তি করে নেওয়া, সেটা এমন কিছু গর্হিত বুলি নি।

কিন্তু ভাবছি কাল সকালের শিশিরে দেশাইয়ের বলে কাউড্রের কী গতি হবে? এ পর্যন্ত সে দেশাইয়ের সম্মুখীন হয়নি, কাল সকালই না তার কাল হয়?

তারও কি কোনো অন্ধ অলঙ্ঘ্য নিয়তি নেই!

এমন কি কোনো দুর্ধর্ষ বউলার নেই যাকে দেখলে ইংলণ্ড ম্রিয়মাণ হয়?

হাটন আর এডরিচ নামল কেন ফার্ণসের বল খেলতে। প্রচণ্ড তাণ্ডব ফার্ণস। লাল সিং-এর পাগড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল, এবার এক বলেই এডরিচের মাথা ফাটাল। এখন কে যায়, এডরিচের জায়গায়? উইকেট-কিপার ফ্রেড প্রাইসকে পাঠানো হল। বলা হল, রান করবে দরকার নেই, শুধু নাইট ওয়াচম্যানের মত জেগে থাকো। প্যাড পরে ফ্রেড যখন নামতে গেল তখন দেখল স্ট্রেচারে করে এডরিচকে নিয়ে আসছে প্যাভিলিয়নে। তার মাথা-মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মাঠের ঘাসেও রক্তের ছিটে।

টলতে টলতে চলল ফ্রেড। প্রথম বল সে অন্ধের মত খেলল, এমন অন্ধ নাকে-চোখেই বুঝি লাগল গোলাটা। সবাই স্ট্রেচারটাকে দাঁড়িয়ে যেতে বললে। বললে, আরেকজন যাত্রীকে নিয়ে যাও।

কী করল ফ্রেড! পরের বলটা স্কোয়ার লেগের দিকে ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হয়ে গেল।

সবাই এল তার আউট হওয়ায় সহানুভূতি জানাতে। হার্ড লাক, ফ্রেড।

ফ্রেড বললে, 'আমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে।'

কী দিয়ে ভোলানো যাবে কাউড্রেকে? জিম পার্কসকে?

সে কি দেশাই না দুরানি? না কি হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে?

মৃগ নেই মৃগয়া

মৃগ নেই, মৃগয়া। প্রেম নেই, ঘর-সংসার। রান নেই, ক্রিকেট।

কটা বন্ধু উপরে-নিচে ঘেঁষাঘেঁষি বেঞ্চিতে বসে বেশ জমিয়ে খেলা দেখছে। সঙ্গে ট্র্যানজিস্টার, বাইনাকুলার, বসবার জন্যে ডানলোপিলো।

'ঐ মেয়েটাকে দেখছিস?'

'না, তার পাশে বসা ছেলেটাকে দেখছি।'

'খেলা ছাখ।' তৃতীয়জন ধমকে উঠল।

'সবই খেলা।' চতুর্থ বললে।

'দেখছিস চোখ দুটো কী সুন্দর!' প্রথম আবার গদগদ হল।

'হয়েছে! এত ঘন ঘন দেখতে হবে না।' তৃতীয় আবার ধমক মারল।

'কী যে বলিস!' প্রথমজন স্তবের মত সুর করে বললে, 'এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার।'

'আমি শুধু ঐ ছেলেটাকে দেখছি।' দ্বিতীয় টিপ্পুনি কাটল: 'এ থিং অফ বিউটি হ্যাজ এ বয় ফর এভার।'

'তা থাকুক। এক কেন একাধিক থাকুক। তাতে কারু ক্ষোভ নেই। কিন্তু যাই বলিস', প্রথম আবার অগাধে চলে গেল: 'চোখ দুটো সত্যি অপরূপ।'

যে 'সবই খেলা' বলেছিল সেই চতুর্থ এবার ঝেঁজে উঠল: 'যে মেয়ে সুইমিং কস্টিউম পরে আসে সে কি আর বলতে পারে আমার চোখ দেখ?'

একমুহূর্ত সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

'নে, নে, খেলা ছাখ, ছাখ বৃষ্টির মধ্যেও কাউড্রে কেমন ঘাসে চিরুনি বুলোচ্ছে।'

এক ঘণ্টায় মোটে তেইশ রান।

সকালে উঠেই খবরের কাগজ দেখলাম, বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা। প্রায়ই ফলে না। তাই মনে হল ভালোয় ভালোয় দিন যাবে।

কিন্তু, না, ইলশেগুঁড়ি ঝরতে শুরু করেছে সকাল থেকে। শীত বের করেছে তার ভিতরের দাঁত।

'অমন অভদ্রের মত তাকাসনে।' দ্বিতীয় প্রথমকে সতর্ক করল।

'যদি না তাকাই তাহলেই অভদ্র ভাববে।'

'কিন্তু যাই বলিস, ওর শীত করছে না?' চতুর্থ আক্ষেপ করল।

'কী করে করবে?' চতুর্থ আবার রূঢ় হল: 'বুকের মধ্যে হয়তো সাহারা জ্বলছে।'

প্রথম আবার স্তবের মত আবৃত্তি করল: 'একখানি শাল ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?'

কিন্তু কাউড্রেকে কী করে আউট করা যাবে বলতে পারো? এ যে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ। নিবৃত্ততৃষ্ণ।

তাকে যে দুর্বার খেলতে বলছ, কই বউলারকে তো দুর্বল বল দিতে বলছ না? বউলার যদি বাইট বল, লাইট বল না দেয়, তাহলে সে ব্রাইট খেলে কী করে? যদি সে উদ্দীপ্ত-উন্মত্ত খেলতে না পারে, সেটা তার দোষ নয়, সেট বউলারের বাহাদুরি!

কিন্তু যখন মারে! তখন সে কী মধুব! কী মোলায়েম! কব্জির একটি নিটোল ঘূর্ণিতেই নির্ভুল বাউণ্ডাবি। কোথা দিয়ে যে বলটা দড়ির দিকে যাবে কেউ যেন সহসা আঁচ করতে পারে না। আর যখন ছুটন্ত বলটাকে দেখা যায়, দেখা যায় সে এক নির্জন অঞ্চলের উপব দিয়েই প্রধাবিত হয়েছে।

এমন একটা নিরঞ্জন মাব দেখতে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করা যায় বৈকি।

কিন্তু কে এই অবিচল ধৈর্য অপরিমেয় সাহসকে পরাভূত করবে?

যদি বৃষ্টি পড়ে!

দেখলে তো পার্কস কেমন নাদকার্নির বলে এল-বি হয়ে গেল। ব্যাট তুলে যখন-তখন হাঁকড়াতে গেলেই চলে না। গরম্ খেলারও ধরম আছে। আজ না হয় গরম সংবাদ হয়ে আছো কাল বাসি হয়ে মুদির দোকানে ঠোঙার মধ্যে গিয়ে বাস করবে।

তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী কিছুতে ভোলবার নয়।

লোভে ভুলছে না, বিদ্রূপে টলছে না, শাসনে হেলছে না, সেই স্তূপীভূত সামর্থ্য আর রাশীভূত দক্ষতাকে কে না প্রশংসা করবে!

সত্যি যদি বৃষ্টি সহায় হয়!

সাড়ে এগারোটার সময় ঘোষণা হল খেলা বন্ধ। আম্পায়াররা বারোটায় ভূমি পরীক্ষা করে দেখবেন মাঠে হাল দেওয়া যাবে কিনা। বারোটা থেকে সময় পেছিয়ে গেল একটায়। একটা থেকে আড়াইটেয়। কে জানে বৃষ্টির ছলনায় গোটা খেলাটাই না খতম হয়।

খেলার মধ্যে অনিশ্চয়তা এই শুধু জানতাম। আজকের হিরো কালকের জীরো, আজকের ঝিনুক কালকের মুক্তো, এরই জন্যেই তো খেলা। এখন দেখা যাচ্ছে সমস্ত খেলাটাই অনিশ্চয়।

"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভালো নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।"

আগেব দিন আগুন, আজ বৃষ্টি। পরের দিন না ভূমিকম্প হয়।

সেই হরিণনয়না কোথায়?

বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ, খেলোয়াড়দের খাঁচায় বিশাল ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই সেই চিহ্নিতা চিহ্নহীনা। হবু-নিউমোনিয়া পরিত্রাণে খেলোয়াড়দের থেকে অটোগ্রাফ নিচ্ছে।

'কিন্তু ওর নিউমোনিয়া সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে', বন্ধুদের দলের কে বললে, 'কাউড্রেকে কী করে আউট করা যাবে!'

আমি বললাম, 'রান আউট।'

একবার প্রথম দিকে সেই সুযোগও এসেছিল। সারদেশাই

এমন গাগলের মতন ছুঁড়লে যে বলটা স্টাম্পের ধার দিয়েও গেল না।

"বলেন কী মশাই, নব্বুয়ে পৌঁছে কাউড্রে রান-আউট হবে?'

'কেন হবে না?' আমার পক্ষে একজন সমর্থক জুটল: 'নব্বুইয়ে এভার্টন উইকস রান আউট হয় নি?'

সে কবে!

উনিশ শো সাত চল্লিশ-আট চল্লিশে, এই ভারতের বিরুদ্ধেই, চতুর্থ টেস্টে, মাদ্রাজে।

যখন সে ছিয়াত্তর, হাজারের বলে উইকেট কিপার পি সেন তাকে ড্রপ করলে। চৌধুরীর বলে উল্কা-উজ্জ্বল মার মেরে নব্বুইয়ে এসে পৌঁছল উইকস। তখন আর কেউ উইকসের আউট চায় না, সবাই চায় সেঞ্চুরি হোক।

মানকড় বল করতে এল। উইকস তাকে কাট করেই ছুটল। সে আশাই করেনি চৌধুরী সে বল ধরবে। চৌধুরী শুধু ধরলেই না, বিদ্যুৎবেগে বল পাঠিয়ে দিল সেনের হাতে। চোখের চকিত পলকে সেন বেল উড়িয়ে দিল।

উইকস নব্বুইয়ে রান আউট হয়ে গেল।

আমরা চাই রবিবাব কাউড্রে সেঞ্চুরি করুক। সেঞ্চুরি করতে না পারলে তারও যে মৃগ-নেই-মৃগয়া হয়ে যাবে।

এক বনে দুই বাঘ

এক বনে দুই বাঘ। এক দিনে দুই সেঞ্চুরি।

কাউড্রে আর জয়সীমা।

কাউড্রে গম্ভীর মন্থর কৃপণনিপুণ। জয়সীমা দীপ্ত দ্রুত সাহস-দুর্বার। কাউড্রেতে দক্ষতা জয়সীমায় লাবণ্য। কাউড্রে যদি জাহাজ, জয়সীমা ময়ুরপঙ্খী।

একশো সাত করে কাউড্রে আউট হয়ে গেছে। জয়সীমা একশো দুইয়ে এখনো নিখুঁত অটুট।

এক দিনে দুই সেঞ্চুরি। এক বৃন্তে দুই ফুল।

আচ্ছা, একদিনে তিন-তিনটে সেঞ্চুরি কেউ করেছে ?

একজন মাত্র করেছে। তার নাম শুনলে বিভোর হয়ে যাবে। তাঁর নাম রণজী।

কেম্ব্রিজে যখন পড়ছে, খেলছে ক্যাসেণ্ড্রা ক্লাবে। একদিন সকাল থেকেই ক্রিকেটের আসর বসেছে। নেমেছে রণজী। দেখতে দেখতে একশো বত্রিশ করে ফেলেছে। ফিল্ডিং আমি পরে করব, দেখি আর কোথাও খেলা হচ্ছে কিনা। মাঠভরা ক্রিকেট, নামতে না দেয় দেখতে দোষ কী। এমন খেলা, খেলতেও যত সুখ দেখতেও তত।

আমাদের একজন সর্ট আছে, তুমি নামবে ? রণজীর কাছে নিমন্ত্রণ আসতেই সে ব্যাট তুলে নিল। লাঞ্চের আগেই দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করে বসল।

এখনো হাতে অনেক সময়। দেখি খুঁজিগে আরেক আসর।

তৃতীয় আসরে সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যাট করে একশো কুড়ি করল রণজী। তারপর বিকেলের দিকে তার সাবেক দলে গিয়ে ফিল্ডিং শুরু করলে।

ইয়র্ক শায়ারের বিরুদ্ধে সাসেক্সের হয়ে খেলে একদিনে সে ছুটো সেঞ্চুরি করলে, প্রথম ইনিংসে প্রথম, দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়। কাউন্টি ক্রিকেটর ইতিহাসে এ রেকর্ড এখনো অম্লান অভঙ্গ।

তবে সার্বিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বলা যায় তেত্রিশ বছর পরে সিডনিতে এক ট্রায়াল ম্যাচে একজন এর সমকক্ষতা করল, প্রথম ইনিংসে একশো চব্বিশ, দ্বিতীয়ে ছুশো পার করে। তার নাম বলতে হবে না। তার নাম ব্র্যাডম্যান।

ওসব ছিল ছুই বনে এক বাঘ। সেসব বাঘা দিন চলে গিয়েছে। এখনকার বাঘেরা ঘাসখেকো ছাগলের পালের সঙ্গে বুঝি মানুষ হচ্ছে।

আজকে সবুজ পেয়ালায় সোনার মদিরা উপচে পড়ছে আকাশ থেকে। নতুন বল তলব করল পাটাউডি। আর সেই প্রথম বলেই কাউড্রে ক্যাচ তুললে। দ্রুতছ্যুতি সেই ক্যাচটা ধরল কে? আগের দিন পারফিটের যে ছু-হাতভরা রাজভোগটা ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। সেই পাটাউডি।

আগের দিন ফকির ছিল আজকে সত্যি সত্যিই নবাব হয়ে বসল।

সংসারে এমন কোনো সুখ নেই যা অন্যকে ছুঃখ না দিয়ে পাওয়া যায়। আমি যদি মামলায় জিতি আরেক পক্ষ পথে বসে। আমাকে পরীক্ষায় প্রথম হতে হলে আরেক-জনকে দ্বিতীয় হবার ছুঃখ দিয়ে হতে হবে। ব্যাটসম্যান যদি সেঞ্চুরি করে বউলারদের মুখ শুকোয়। আর পাটাউডি যদি ক্যাচ ধরে সুখী, ভুল মারের জন্যে কাউড্রের মনস্তাপ।

সবচয়ে বেশি সুখ উত্তাল জনতার। একজনের নিধনে এত জয়োল্লাস!

জনতার হিসেবে যে পাটাউডি আগের দিন সামান্য বেনে ছিল, আজ সে পোদ্দার হয়ে উঠল। যে ছিল চক্ষুশূল সে হয়ে দাঁড়াল নয়নের মণি।

তাঁর বাবা ইফতিকার আলি অক্সফোর্ডের হয়ে কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে তুশো আটত্রিশ করলে। তুশো আটত্রিশ নট আউট। তার পরের বছর উনিশশো বত্রিশে সিডনিতে ইংলণ্ডের হয়ে প্রথম টেস্টে সে একশো তুই করলে। রণজীর মত, তাঁর ভাইপো দলীপের মত সেও প্রথম টেস্টে নেমেই সেঞ্চুরি করলে। কে মনে রাখবে সে সেঞ্চুরি করতে সোয়া পাঁচ ঘণ্টা লেগেছিল। কে মনে রাখবে কত ঘণ্টার চেষ্টায় কাউড্রের এই তিল-তিল সঞ্চয়! সেঞ্চুরি সব সময়েই সেঞ্চুরি।

ইফতিকারের ভীষণ সাধ তাঁর ছেলে 'টাইগার'ও তারই মত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সেঞ্চুরি করে।

বাপের সে অভিলাষ পূর্ণ করেছে টাইগার, যদিও ইফতিকার নিজের চোখে দেখে যেতে পারেনি। উনিশশো একষট্টি সালে মাদ্রাজ টেস্টে সে একশো তিন রান করলে।

জনতার মধ্যে কে মনে করে রেখেছে সে একশো তিনের মধ্যে তুটো প্রকাণ্ড ছয় আর ষোলটা অখণ্ড চার ছিল! যেহেতু তুমি পর-পর ম্যাচে ব্যাটিংএ ব্যর্থ হয়েছ, ফেলে দিয়েছ পারফিটের ক্যাচ, সেহেতু তুমি আমাদের চোখের বালি। আর যেই তুমি কাউড্রের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা ধরে ফেললে মুঠোর মধ্যে, সেই হেতু তুমি আজ আমাদের চোখের কাজল হয়ে উঠেছ।

যদিও মনস্থরের ডাকনাম টাইগার, আসল বাঘ, জ্বলন্ত জীবন্ত বাঘ জয়সীমা। এককালে সেও কত গঞ্জনাভাজন ছিল জনতার, আজ সে সকলের রাজা হয়ে উঠেছে। 'কনককুণ্ডলবান কিরীটী হারী' সুপুরুষ। যে একদিন তৃণখণ্ডের মত জনতার কাছে তুচ্ছ হয়ে থাকে সেই আবার একদিন শতশাখাবিতত বটবৃক্ষ হয়ে ওঠে।

বিরানব্বুইয়ের মাথায় যে তুর্ধর্ষ ছয় মারে আর আটানব্বুইয়ের মাথায় তুঃসাহসী চার, সেই সফলমনোরথের প্রতি সকলে প্রীতি-প্রেরিত হয়ে উঠবে তাতে আর বৈচিত্র্য কী?

ঐ উচ্ছ্বসিত ছয় আর সমুদ্ধত চারই তো বিশেষ বৈচিত্র্য।

জনতাকে দোষ দিও না। সে নগদ সওদার খরিদদার। তার একমাত্র পণ্য উত্তেজনা। দর্শককে তুমি দার্শনিক হতে বোলো না। তাকে শুধু তুমি জাগিয়ে রাখো, দাঁড় করিয়ে রাখো। সে পরিতৃপ্ত হতে চায় না, সে প্রজ্জ্বলিত হতে চায়।

কত সাধ্যসাধনা বা চুবিচামারি করে সে একখানা টিকিট জোগাড় করেছে। দিনেব এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লাইন দিয়ে, বাসে ট্রামে কী কবে সে এসেছে, চাকার সঙ্গে পাক খেতে খেতে, কখনো বা শুদ্ধ পায়ে হেঁটে, আপিস পালিয়ে, ছুটো খেয়ে না-খেয়ে, ওঠবোস করতে-করতে,—তারপর তুমিও যদি সহানুভূতিতে না-নড়ো-চড়ো, পর্বতের মত স্থির থেকে অন্ধের মত খালি ঠুক ঠুক কবো, তবে তাদের না চেঁচিয়ে, মহাদেবের চবণে সেবা না লাগিয়ে উপায় কী! আমাদেব সচ্ছল উত্তেজনা দাও, আমরা তোমাদের রাজাব বাজস্ব দেব।

ক্রিকেটের স্তব্ধতা

তারপর স্তব্ধতা নেমে এল।

'নীরব রবাব বীণা মুরজ মন্দিরা'। আর ব্যাট-বলের সম্ভাষণ শুনব না, শুনব না হাততালি, শুনব না বিউগল, ঝিঁঝিঁ বাজি, পাখির শিস্, বেসুর মায়াকান্না, শুনব না শত কণ্ঠের হাউজাট। হরিধ্বনিও আর দেবে না কেউ একযোগে।

সূত্রচ্ছিন্ন মালার ফুলদলের মত ক্রিকেটের রঙিন মুহূর্তগুলি খসে খসে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোজকার মত ঝাড়ুদার ছোঁড়াগুলো পেতে-বসা টাল-টাল খবরের কাগজের শিটগুলো নিয়ে গেল ছু হাতে। ক্রমে ক্রমে আরো সব নিয়ে যাবে। চট খুঁটি দড়ি তক্তা শালু সতরঞ্চি কিছুই রাখবে না। যা রেখে যাবে তা বহু সহস্র মানুষের পীড়িত দলিত মথিত হৃদয়ের স্তব্ধতা। এ স্তব্ধতার কোনো ব্যাঞ্জনা নেই তাৎপর্য নেই! এ স্তব্ধতারই আরেক নাম নৈষ্ফল্য।

এক মাতাল মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমাকে দেখে বলেছিল, মা, যতই সাজো আর গোজো, দু দিন পর তোমাকে টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে। বাইরেই তোমার চেকন-চাকন, ভেতরে খ্যাঁড়।

চরম খাঁটি কথা। বাইরেই যত সাজসজ্জা, প্যাডস-গ্লাভস, ভেতরে ড্র।

বাহ্যই বড়, আসলে ঢেঁকি ফোঁপরা। এ কেবল খালি-হাঁড়িতে পাত বাঁধা। একটা প্রাণহীন আপোসের জন্যে এত কামড়াকামড়ি। খেলাটাকে শেষ পর্যন্ত এলেবেলে করে দেবার জন্য এই লম্ফঝম্প!

তা কী করা যাবে! যার যেমন মন তার তেমনি ধন।

যারা পোষমানা ব্যাটে খেলে তাদের অদৃষ্টে আপোস ছাড়া আর কী জুটবে।

তবু যা হোক চারখানা ছয় দেখলাম ইডেনে। কাল একখানা জয়সীমার, আজ একখানা দুরানির আর দু-দুখানা মাইক স্মিথের। দেখলাম একশো উনিশে জয়সীমার আউট হওয়া, লার্টারের হাতে। এ বছরে কলকাতার টেস্টে চোখ ভরে দেখার মত, এক, ইডেনের ঘন তেজী সবুজ ঘাস, আর দুই, জয়সীমা।

কিন্তু বলিহারি মঞ্জরেকারকে। কিছুতেই কাটবে না কুটবে না, শুধু স্যাকরার মত ঠুক ঠুক করবে। তেমনি আউটও হয়ে গেল, বোল্ড আউট। সমস্ত আউটের মধ্যে যেটা একেবারে চণ্ডাল আউট। তা মারতে গিয়ে নয়, নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে। সেই কড়ি ক্ষয় হল তবু বউ সুন্দর হল না।

ফিল্ড করতে নামলই না মঞ্জরেকার। কেউ কেউ বললে, মঞ্জু-দিদির মাথা ধরেছে। আবাব কেউ বললে, ও জনতাব প্রিয় নয়, বল ধরলে বা ধরতে ছুটলেই লোকে ওকে ব্যাবাক করে, সেই অভিমানে খাটনি দিতে আসেনি।

কটা ভালো মার মেবেছে পাটাউডি। একত্রিশ কবেছে। কিন্তু এম সি সির দ্বিতীয় ইনিংসেব গোড়াতেই সে যে কী সুবোদে কটা ওভার বল করলে তা বোঝা কঠিন। আর ততোধিক দুর্বোধ্য কেন ডিক্লেয়ার কবতে দেরি করল। তিনশো করে দেড়টাব সময় ডিক্লেয়াব করলে সে খেলার আর থাকে কী।

দুর্বোধ্য কেন বলি? পাটাউডি ড্র-টা নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত করে নিয়ে দান ছাড়ল। তাতে কি আর খেলা জমে? ভয় না থাকলে কি ভালোবাসা জমে? মাঝে মাঝে একটু সন্দেহ না থাকলে কি ভগবানে মন যায়?

তাই স্তব্ধতাটা খেলার ঠিক শেষেই নয়, খেলার মাঝখান থেকেই। বারোটা বেজে যেতেই।

অথচ ক্রিকেটের কী সুন্দর নিজস্ব কতগুলি স্তব্ধতা আছে। সে সব কত দেখেছি ইডেনে। সে সব স্তব্ধতা খেলাকে বাঙ্ময় করে রাখে। ধরুন, বিপক্ষ দলের কেউ লং-অনে আকাশচুম্বী ক্যাচ তুলেছে. আমাদের একজন শ্রীমান ছুটে গিয়ে সেটাকে করায়ত্ত করছে। তাক সই করে দাঁড়িয়েছে উঁচুতে মুখ করে, দু হাতে কোটর নির্মাণ করে। এখন প্রশ্ন এই, বাবাজীবন সেটি ধরতে পারবেন কিনা, না ফেলে দেবেন।

মনে করুন সে কী সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই। এতক্ষণ যারা হৈ হল্লার শ্রীক্ষেত্র করে রেখেছিল তারা মন্ত্রবলে পাথর হয়ে গিয়েছে। অমৃতফল ধরে না হেলাভরে ধূলিসাৎ করে দেয়!

ধরুন যখন পঙ্কজ রায় কি জয়সীমা নিরানব্বুই করেছে। বাকি রানটা করতে পরে কিনা তারই জন্যে স্তব্ধ জনতা নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটা আঘাত সঙ্গীতে পরিণত হয় কি না তারই সুতীক্ষ্ণ প্রতীক্ষা। ধরুন যখন নতুন বল নিয়ে দেশাই কাউড্রেকে আক্রমণ করতে আসে সবাই ব্যাকুলতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে অভাবনীয় ঘটে কিনা। একসঙ্গে অনেকগুলি সেতার সূর্যকিরণের ছোঁয়া লেগে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কিনা। সামান্য দু চারটে রান হলেই জিতে যায়, শেষ ব্যাটসম্যান নেমেছে, তখন প্রতি বলে স্তব্ধতা। আর ওয়েসলি হল যখন বল করে তখন প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই নাকি হৃৎপিণ্ডটা পকেটে রেখে স্তব্ধ হয়ে মুহূর্ত গোনে।

সে সব রোমাঞ্চকর স্তব্ধতার বদলে এ কী জীর্ণ শীর্ণ স্থবির স্তব্ধতা আমাদের এনে দিল পাটাউডি।

তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্যাভিলিয়ন থেকে মাইকে ঘোষণা আর শুনতে হবে না। এমন নিরঙ্কুশ ভুল ইংরিজে সরবে উচ্চারিত হতে শুনব—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শ্রু অভাবনীয়। আর খবরগুলোও কী বিকট। নিমতলায় যাও, সৎকারে গিয়ে যোগ

দাও। ডাক্তারকে বলছে, অপারেশন করতে এস। কে হে আপিস পালিয়ে এসেছ, আপিস তোমাকে ডাকছে।

আরো শাস্তি, আনাড়ি-আকাটদের মুখে প্রশ্ন ও মন্তব্য দুই-ই যুগপৎ স্তব্ধ হবে। চোখের উপর খেলা দেখেও বোঝে না কিসে কী হল, তাই আবার রেডিও খোলে।

'হ্যাঁ গা, গলিতে একজন দাঁড়িয়ে আছে বলছে, মাঠের মধ্যে গলি কই?' এক গা-ঢালা মহিলা পাশে-বসা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে।

স্বামী উদাসীনের মত বললে, 'ঐ কোনো একটা জায়গায় হবে। ব্যাটে-বলে খেলা দেখ, অলি-গলির সন্ধানে দরকার কী।'

সেই শোকার্ত ইংরেজ মহিলার কথা মনে পড়ছে। রেডিওতে খেলা শুনতে এসে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল: 'এদের কী উপায় হবে, কী করে খেলবে এরা? এদের একটার লং লেগ, আবেকটাব শর্ট লেগ, তৃতীয়টার আবার স্কোয়্যাব—'

যেই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় সেই মাটিকে আব ধুলো কবে দেওয়া নয়

আমরা স্তব্ধতা চাই না, শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কতা, আমরা চাই আনন্দ-কলমন্দ্র-কল্লোলিত যুদ্ধজয়ের কোলাহল।

ক্রিকেটই প্রতীক্ষা শেখায়। আমরা থাকি প্রতীক্ষা করে আবার প্রস্তুত হই

ক্রিকেটের আঙুল

হাউ! বহু মুখে একসঙ্গে একটা রাক্ষুসে চিৎকার উঠল।

আর অমনি উঠে গেল আঙুল। আউট। শেষ—খতম—অবসান। ভবলীলার সমাপ্তি। বেচাকেনা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। উঠে গিয়েছে হাট-পাট। এবার প্রস্থান করো। যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে চলে যাও।

খুঁতমুতুনি চলবে না। নিয়তিব নির্দেশ, আম্পায়ারেব আঙুল উঠে গিয়েছে। সুতরাং কথাটি নয়, হট যাও। ভাগো। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ো।

না, কথাটি নেই। স্পিকটি নট। তোমাব প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। ভুল আব করব না স্যার, আব একটা চান্স দিন স্যার, নেই বা কোনো ক্ষমা চাইবার অধিকার। অনেক কাজ এখনো বাকি, জীবনে এখনো অনেক আশা, ব্যাটে এখনো অনেক রান, সমস্ত অনুনয়-বিনয় অর্থহীন। আঙুল একবার উঠে গিয়েছে কী তোমার বারোটা বেজে গিয়েছে। যমের মোষের গলার ঘণ্টা যখন বাজে তখনই মানুষের বারোটা।

কত তোড়জোড় করে, কত সাজগোজ। ধবধবে পোশাক পরে, প্যাড বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। তারপর যখন ডাক আসে, বাছা ব্যাট তুলে নিয়ে দস্তানা আটতে-আঁটতে মাঠে নামে। কায়দার মাথায় হাঁটতে-হাঁটতে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখোমুখি আম্পায়ারের কাছ থেকে গার্ড নেয়। যথাবিধি দাগ কাটে। ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করে কেমন করে মাঠ সাজিয়েছে। কোন অংশ নির্জন, কোন অঞ্চল নিরাপদ। কোন রেখায় বা ব্যূহকে বিদীর্ণ করা যাবে। মনে-মনে হিসেব-নিকেশ শেষ করে বল-এর

আশায় ঝুঁকে দাঁড়ায়। যার যত তুক-তাক মন্তর-তন্তর আছে গোপনে সেরে নেয়। হ্যাঁ, রেডি, বল করো।

হাউজাট ? হাউজ দ্যাট-টা ঐ আকার নিয়েছে। এখন আরো সংক্ষেপ হয়ে শুধু একটা রাক্ষুসে হাউ।

নির্মম নিয়তি আঙুল তুলে দিয়েছে। এল-বি, লেগ বিফোর— বাঙলায় বললে অগ্র-পদ।

প্রথম বল স্যার, জীবনের প্রথম ভুল। ইচ্ছাকৃত নয় স্যার, টু আর ইজ হিউম্যান স্যার। এবারটি ছেড়ে দিন। এক বল-এ, প্রথম বল-এই আউট হয়ে গেলে লোকে বলবে কী। পরের ম্যাচে আর নেবে না, চিরদিনের মত বাদ পড়ে যাব। বাড়িতে ছোট ছেলেটার অসুখ, চার ঘণ্টার উপর প্যাড বেঁধে বসে আছি, এই একবার শুধু রেহাই দিন স্যার—আপনার হাতেই যখন আমাদের প্রাণ, আপনি না দেখলে কে দেখবে ? কে বাঁচাবে ?

নট নড়নচড়ন। আঙুল বেঁকবে না, টলবে না, কাঁপবে না। তার দয়ামায়া বলে কিছু নেই। শূন্য না সেঞ্চুরি, না কি এক রান কম একশো, ভ্রূক্ষেপও করে না। তার কিছুতেই আপত্তি নেই, চিন্তা-বিলাপ নেই। সমস্ত বিক্ষেপ-বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে সে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাটসম্যান যদি শুধু যোগী, আম্পায়ার মহাযোগী।

নর্দাম্পটনশায়ারের পার্সি ডেভিস ব্যাট করতে নেমেছে। এসেক্সের রীড, দুর্ধর্ষ রীড, বল করছে। প্রথম বল ডেভিসের ডান হাতের আঙুলের উপর লাগল—গেল বুঝি আঙুলগুলো। যন্ত্রণায় আঁধার দেখল চারদিক। দ্বিতীয় বল লাগল বুকে, হৃৎপিণ্ডের নিচে, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ডেভিস। সামলে উঠতেই তৃতীয় বল লাগল বাঁ উরুতের উপর। চতুর্থ বল বাঁ হাতে। ডান হাতের আঙুল তখনো টনটন করছে—তার উপরে আবার বাঁ হাতে। পঞ্চম বল লাগল পেটে, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেল মনে হল। তারপর ষষ্ঠ বল—শেষ বল প্যাডে এসে লাগল।

হাউ! প্রতিপক্ষ দল গর্জে উঠল সমস্বরে।

পর-পর এতগুলো মার খেয়েছে, সারা শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে—তবু আম্পায়ার এতটুকু দয়া দেখাল না। আঙুল তুলে দিল।

আর এমন অদৃষ্ট, ষষ্ঠ বল শুধু প্যাডেই লাগল না, গড়িয়ে গিয়ে উইকেটও ভেঙে দিল।

কি, আর কিছু বলবার আছে? ক্রিজ থেকে প্যাভিলিয়ন একশো গজ দূরে, কিন্তু ফিরে যাবার সময় ডেভিসের মনে হল যেন এক মাইল পথ হাঁটছে।

কত উদ্যোগ আয়োজন, কত স্বপ্নের চন্দ্র-সূর্য তৈরি করা—সব এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। জাতও গেল ভাতও জুটল না। সর্বাঙ্গে মারই খেল, উলটে নিজে মারতে পারল না এক ঘা।

তা হলে আউট হল কিসে? এল-বি, না, বোল্ড? এল-বি। প্যাডে লাগামাত্রই আঙুল তুলে দিয়েছে আম্পায়ার।

ট্রেন্ট ব্রিজ-এ প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছে ব্যারিংটন। অন্য প্রান্তে পিটার মে। এক বল—দু' বল—তিন বল খেলল, চতুর্থ বল-এ হঠাৎ খোঁচা মেরে বসল। ব্যারিংটন জানে—কে না জানে—এমনি খোঁচা মারাই বিপদ ডেকে আনা। তবু কেন কে জানে, জানা-শোনা সত্ত্বেও মুহূর্তের বিভ্রান্তিতে বল-এ ঠোকর মারল। সঙ্গে সঙ্গেই আঙুল তুলে দিল আম্পায়ার। ক্যাচ-বিহাইণ্ড।

তার মানেই ম্যাচ বিহাইণ্ড। সমস্ত ম্যাচ পড়ে রইল তোমার পিছনে। তুমি বৃহৎ একটা শূন্যে গিয়ে প্রবেশ করো।

ড্রেসিং-রুমের পিছনে নিরালায় মনমরার মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ব্যারিংটন।

'তাতে কী।' কেউ কেউ এল তাকে সান্ত্বনা দিতে। বললে, 'লেন হাটনও প্রথম টেস্টে জিরো করেছিল।'

এ কি একটা সান্ত্বনা হল? ব্যারিংটনের কেবলই মনে হচ্ছিল

আম্পায়ারের আঙুলটা যদি না থাকত! যদি তাকে কেটে দেওয়া যেত ছুরি দিয়ে।

ইংলণ্ডের সবচেয়ে সেরা যে আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার, যাকে ব্র্যাডম্যান পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছে, তার গোটা একটা হাতই তো কাটা। তবু অন্য হাতের তর্জনী তুলতে সে কি পেছপা হয়েছে কোনোদিন?

না, কি 'নো' বলতে?

এল-বি'র আপিল হল, আর আম্পায়ার 'নট-আউট' হেঁকে ঘাড় ফেরাল। সে-ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান বেঁচে গেল, কিন্তু মারা পড়ল বউলার। তখন ব্যাটসম্যানের মুখ হাসি-হাসি, বউলারের মুখ অমানিশা। কারু পৌষ মাস হলেই কারু সর্বনাশ হবে। ব্যাটস-ম্যানের রান, বউলারের এভারেজ। এ বাড়ে তো ও কমে। ও ঝিলিক মারে তো এ মিইয়ে যায়।

ভবের বাজি বোঝা ভার। কে বাঁচে কে মরে। কখন বাঁচে কখন মারে। ব্যাটসম্যানকে মারতে 'তর্জনী' আর বউলারকে মারতে 'মুখের বাণী'। 'হাউজাট?' অস্ট্রেলিয়ার এগারোটা ফিল্ডার একসঙ্গে এল-বির আপিল করে উঠল।

চেস্টার বলে, এল-বি'র আপিল করবে শুধু বউলার আর উইকেটকিপার। বাকিগুলো রব তোলে কী করে? ওরা কি কিছু দেখেছে, না, ওদের পক্ষে দেখা সম্ভব?

অস্ট্রেলিয়ানদের এ সব বন্যতা চেস্টার সহ্য করতে পারে না।

'হাউজাট?'

'নট-আউট।' চেস্টার প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে।

তা ভদ্রভাবে বলো। অমন খেঁকাও কেন? অস্ট্রেলিয়ানরা আপত্তি করে।

'ঐ আমার ধরন।' বলে চেস্টার। 'তোমরা অমন তাণ্ডবনৃত্যে আপিল করো কেন?'

বারবাডোস টেস্টে কিথ মিলার প্রথম ইনিংসসে ১৪০-এর মাথায় খুঁচ করে ক্যাচ তুলে দিয়েছে উইকেটকিপারের হাতে। মিলার নিঃসন্দেহ, সে আউট হয়েছে। তাই কোনো দিকে না তাকিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে শুরু করেছে হাঁটতে। সে কী, কোথায় যাচ্ছ? কাছাকাছি ফিল্ড করছিল উইকস আর ওয়াটসন—বললে, আম্পায়ার তোমাকে আউট দেয়নি। আম্পায়ারের দিকে তাকাল মিলার। সত্যিই, আউট দেয়নি। টি-টাইম বলে 'বেল' তুলে পকেটে পুরে সেও যাত্রা করেছে প্যাভিলিয়ন।

কিন্তু মিলার আর নামল না ব্যাট করতে। আম্পায়ার না জানলেও সে জানে সে আউট। সে প্রবঞ্চনা করতে আসেনি। সে ক্রিকেট খেলতে এসেছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে কী হল?

এটকিনসনের বল মিলারের ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লাগল। যথারীতি আপিল করল এটকিনসন, কিন্তু যেহেতু বল আগেই ব্যাট ছুঁয়েছে তার আপিলে তেজ ফুটল না, নিষ্প্রাণ শোনাল। কিন্তু ললাটের লিখন খণ্ডাবে কে? আম্পায়ার তুলে দিল আঙুল।

অবাক্যব্যয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল মিলার। তার সাধুতার পুরস্কারে এই পরিহাস। কিন্তু সন্দেহ কী, দুই-ই ক্রিকেট।

পিটার মে'র বেলায় সেবার কী হল? একটা চমৎকার উঁচু শট মেরেছে মে, ঠিক এক ফিল্ডারের হাতে পড়েছে। আর কী—আউট —মে ফিরে চলল প্যাভিলিয়ন।

কিন্তু, না, আউট হয়নি, ফিল্ডার শেষ পর্যন্ত বল ফেলে দিয়েছে মাটিতে! কিন্তু মে কই? সে ততক্ষণে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। যে ফিল্ডার ক্যাচ মিস করেছিল সে ততক্ষণে বল ছুঁড়ে দিল উইকেটকিপারের দিকে। বল ধরে উইকেট-কিপার স্ট্যাম্প ভেঙে দিল। ক্যাচ-আউট নয়, পিটার মে রান-আউট হয়ে গেল।

নিয়তি কেন বাধ্যতে?

রান করতে গিয়ে ব্যাটসম্যান ব্যারিংটনের সঙ্গে বউলার নাদ-কার্ণির সংঘর্ষ হল। আর সেই ফাঁকে ব্যারিংটন যে প্রান্তে ছুটে আসছিল সে প্রান্তের স্ট্যাম্প ভেঙে দেওয়া হল। তবে কি রান-আউট হল ব্যারিংটন? যেহেতু নাদকার্ণি তাকে পৌঁছুতে বাধা দিয়েছে সেই হেতু কি সে রেহাই পাবে না? কী বলে আম্পায়ার?

আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছে। রান-আউট ব্যারিংটন।

যেহেতু নাদকার্ণির বাধাটা ইচ্ছাকৃত নয়, বল দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে ছুটে আসতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, সেহেতু ব্যারিংটন অবস্ট্রাকশন-রুলের সুবিধে পাবে না।

কিন্তু সেদিনের সেই উত্তোলিত আঙুলকে ধিক্কার দিয়েছে ব্যারিংটন। ধিক্কার দিয়েছে তাব ক্যাপ্টেন, টেড ডেক্সটার। বলেছে ইট ইজ নো ক্রিকেট।

মনে-মুখে যাই বলো কারু সাধ্য নেই আম্পায়াবের আঙুলের বিরুদ্ধে আঙুল তোলো।

কিন্তু সোলোমনের টুপি যা ঘটাল তাই কি ক্রিকেট? তাগড়া মারে বেনোর বল হাঁকড়াল সোলোমন আব তাব মাথাব টুপি খসে পড়ল স্ট্যাম্পেব উপর। 'বেল'ও খসে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে।

হাউজাট?

আঙুল উঠে গেল আম্পায়াবেব। আউট—বোল্ড-আউট সোলোমন।

আচ্ছা, বেনোর এতে কী কৃতিত্ব? ব্যাটসম্যান হিট-উইকেট হয়, কিম্বা পিছিয়ে খেলতে গিয়ে পা দিয়ে স্ট্যাম্প মাড়িয়ে দেয়, তাতে বউলারের নিশ্চয়ই বাহাদুরি আছে। কিন্তু স্ট্যাম্পের উপর টুপি খসে পড়বে এতে তার কিসের কেরামতি? এ তো একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু কে না জানে দুর্ঘটনাই ক্রিকেট।

এমনিতে দুর্ঘটনা দুঃখের। কিন্তু ক্রিকেটের দুর্ঘটনা মজার। মজার রাজা ক্রিকেট।

একবার হাটনেরও টুপি পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু চরম সর্বনাশ ঘটেনি। অস্ট্রেলিয়ানরা এমন টুপি পরে যা কোনো অবস্থাতেই পড়ে না। আর, বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, ব্যাটে-বলে সমান ধুরন্ধর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স, ব্যাট করতে নামে খালি-মাথায়। যে নিজেই 'সোবার', ধীর স্থির সুস্থমস্তিষ্ক, সে বিশ্বাস করে মাথা খোলা রাখলেই বুঝি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়।

কিন্তু দর্শকদের মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় কই, বিশেষত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়রা মেনে নিচ্ছে বটে কিন্তু দর্শকেরা সব সময়ে দার্শনিক থাকতে রাজি নয়। সেবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফলো-অন এড়াতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সামান্য কটা রান মাত্র বাকি, খেলছে হোল্ট আর ম্যাকওয়াট—শেষ জুটি—খুব পিটিয়ে খেলছে, দুজনে মিলে ৯৯ রান করেছে—হঠাৎ আম্পায়ার ম্যাকওয়াটকে রান-আউট দিয়ে দিল। সিদ্ধান্ত যে ন্যায্য, এ বিচারের মনোভাব দর্শকদের তখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তারা মাঠের মধ্যে বোতল ছুঁড়ে মারতে লাগল। তাদের ক্রোধ যে প্রধানত আম্পা-য়ারের বিরুদ্ধে তাতে সন্দেহ নেই, তবে দু-একটা বোতল বিপক্ষ দলের মাথায় পড়লেও তাদের আপত্তি ছিল না। কী দুর্দান্ত ভয়ে পালাল আম্পায়ার—একটা নেংটি ইঁদুরও অমনি করে পালায় না। পুলিশ-পাহারায় বাড়ি ফিরল আর তাকে নির্বিঘ্নে রাখবার জন্যে সারা রাত তার দরজায় মোতায়েন রইল এক সাঁজোয়া বাহিনী।

কিন্তু আরেকবার কী হল? জনতা আম্পায়ারের নাগাল না পেয়ে তার স্ত্রীকে আর তার ছেলেকে মেরে দিয়ে এল।

আর পাকিস্তানের আম্পায়ার ইদ্রিস বেগ-এর সঙ্গে এম সি সি'র খেলোয়াড়রা খেলার শেষে মাঠের বাইরে, হোটেলে, কী দুর্ব্যবহার করেছিল সে কাহিনী আরো চমকপ্রদ।

মোট কথা খেলার মধ্যে 'দমদম দাওয়াই' না আসাই মঙ্গল।

অপার নদী কোথায় আছে

হাতের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট খেলতে এসেছে কলকাতায়। পাটাউডি জিতল এবার টসে, কিন্তু নিজে ব্যাট না নিয়ে বল নিলে। হয়তো ভাবল, মাঠ নরম আছে, বেড়ালে আঁচড়াবে ভালো। কিন্তু কোনোই সুরাহা হল না, লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত সমানে ব্যাট চালাল সিম্পসন আর লরি। কারুর আউট হবার মন নেই, ভঙ্গি অভঙ্গুর, মনে হল সারাজীবন না হোক সারা দিন এমনি চালিয়ে যাবে ক্লান্তিহীন। বম্বেতে হেরে গেছে, আর কী ওরা মচকাবে! আর কে কোথায় আছে আমাদের শমনদমন রাবণ বাউলার, হল বা ম্যাকেঞ্জি, গ্রিফিথ, বা ট্রুম্যান! তখন অনেকে পাটাউডিকে তিরস্কার সুরু করল, কী দরকার ছিল ব্যাট ছেড়ে দিয়ে! আর যে দুরানি গুচ্ছের নো-বল দিচ্ছে, কোনো-কোনো ওভারে চোদ্দখানা পর্যন্ত রান ছাড়ছে, তাকে দিয়েই বল দেওয়াবার এ কী দুরাগ্রহ!

মনে হল এ অধন্য দিন বুঝি আর কাটে না। 'দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।'

কিন্তু অপার নদী কোথায় আছে? এমন কী বাধা আছে যাকে বধ করা যায় না? শুধু ধৈর্য ধরে থাকো। উদ্যত মুষ্টি শিথিল কোরো না।

লাঞ্চের পর দুরানির বলেই লরি আউট হয়ে গেল, একেবারে সরাসরি বউলড। ব্যাটে-বলে ভালোবাসার সামান্য গরমিলেই এই ঘরভেদ। কথার বলে, ভলোবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুন। কম হলে লাগে ঝাল, বেশি হলে পোড়ে গাল। ব্যাটে-বলের বেলায় কম হলে 'কট্', বেশি হলে 'বউলড।'

লাঞ্চ-স্কোর কোনো উইকেট না হারিয়ে সাতাশি ছিল, এখন দাঁড়াল এক উইকেটে সাতানব্বুই। পনেরো মিনিট পরে কাউপার এসে নাদকার্নির হাতে ধরা পড়ল, বউলার সেই ছুরানি। একটা প্রকাণ্ড চার মেরে দেখতে-দেখতে বার্জের ভরাডুবি হল, সেই ছুরানিই বউলার। ঠিক পরের বলেই বুথ ভূত হয়ে গেল। এল রেডপাথ। যা অঘটন ঘটছে, ছুরানির না হ্যাট্রিক হয়!

তারপরেই ধুলোর ঝড় উঠল, নামল বৃষ্টি। চার উইকেটে একশো নয়, খেলা মুলতবি রইল।

বৃষ্টি ধরতেই আবার খেলা সুরু, কিন্তু 'এ কী আকুলতা ভুবনে, এ কী চলঞ্চতা পবনে', সুর্তির বলে আউট হয়ে গেল সিম্পসন। সবাই ভেবেছিল সিম্পসন নিশ্চয়ই শতমারী হবে, কিন্তু নিশ্বাসে যেমন বিশ্বাস নেই তেমনি ক্রিকেটেও নিশ্চয় নেই। সাতষট্টি করে পিঠ দেখাল সিম্পসন। তারপর 'এ কী মধুর মদিব রসরাশি,' ভিভার্স ছুরানির বলে পাটাউডির হাতে বন্দী হল।

আর এত দুর্ধর্ষ বল করল ছুরানি, সুর্তির বলে জার্মানের সোজা শস্তা ক্যাচটা ধরতে পারল না! যদি ধরতে পাবত তাহলে প্রথম দিনের খেলার শেষে ছয় উইকেটে নয়, সাত উইকেটে ১৬৭ হয়ে থাকত।

শুধু বিশালতৃষ্ণ হও। অস্ট্রেলিয়াকেও হারানো যায়। শুধু যা পূর্ণ প্রাণে চাইবার মতন, তাকে রিক্ত হাতে চাইতে যেয়ো না। কেননা কে না জানে শেষের সুখই সুখ।

উঠল তারা আকাশ ভরা

তারপর বোরদে বুথের বলে একটা ওভার বাউণ্ডারী মারলে।

সে কী মার! সপ্ত সমুদ্র দশ দিগন্ত এক সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠল। দর্শকদের সে কী গর্জন! এতক্ষণে যেন পরিপূর্ণায়তন হল। অচ্ছোদ বৃষ্টির জল পেয়ে গেল চাতকিনী।

বোরদের কথা পরে হবে। আগে ভিভার্সের কথাটা বলে নিই।

'ভিভার্সের কী টায়ারলেস এফর্ট!' এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, 'সেই কখন থেকে একটানা বল করছে। ক্লান্তি নেই।'

'ঠিক আমাদের জয়ন্তীর মত।' দ্বিতীয় বন্ধু বললে, 'তবে ভিভার্সের লক্ষ্য স্টাম্প, জয়ন্তীর লক্ষ্য স্বামী।'

'কই, এসেছে নাকি?'

'বা, ঐ তো তোর সামনে।'

সমবেদনায় আমিও তাকালাম। দেখলাম নামধেয়াকে। আগে লজ্জা নারীর ভূষণ ছিল, এখন লজ্জা নারীর বসন হয়েছে।

'বীরবাহু বটে!' বললে প্রথম বন্ধু।

'কাকে বলছিস? ভিভার্সকে?'

'না, তোর জয়ন্তীকে। বাহুতে তুমি মা শক্তি যখন বলেছে তখন সমস্ত বাহু মুক্ত না রাখলে চলে কী করে?'

'আর ভক্তের জন্যে কিঞ্চিৎ হৃদয়কে। হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তা ওর টায়ারলেস এফর্টে কিচ্ছু হল? স্বামী জুটল?'

'দেখি না তো!'

'এবার যদি য়্যাটায়ারলেস এফর্টে হয়!'

হাসির সঙ্গে-সঙ্গেই বোরদের নয়-ছয় করা ছয়ের মার। আর

তখুনি দেখলাম স্বর্গোত্থানে কাকে বলে যোজনায়ুতবিস্তীর্ণা উত্তুঙ্গ-তরঙ্গিনী মন্দাকিনী।

বোরদে নট-আউট আটষট্টি। তার মধ্যে আটটা চার, একটা সিংহহুঙ্কার ছয়!

তা হলে মাঠে মার চলে!

চলে বৈ কি! যে সাহসে উজ্জ্বল, সংকল্পে গম্ভীর, সেই পারে রান তুলতে, সেই পারে শুকনো কাঠে ফুল ফোটাতে, পাষাণ গলিয়ে ছোটাতে ক্ষীরধারা।

কেন সিম্পসন একশো পনেরো মিনিটে চৌদ্দখানা চার মেরে একাত্তর করল না?

যখন ভৃগুপাত হয়ে গেল, পাটাউডি দু রানে কাবার হয়ে গেল, তখন পিচ-পণ্ডিতের দল বলতে লাগল এ মাঠে ভুষ্টিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু নাচতে ভুল করবে তুমি, দোষ হবে উঠোনের? নইলে নাম-নিশানা নেই ঐ একটা নবাবের মার?

তারপর নাদকার্নী কী করল? সিম্পসনের বলে ভিটেতে সর্ষে বুনে দিল! সাত উইকেটে একশো ছেষট্টি।

উদ্ধতির মূর্তি ধরে স্ফূর্তি এল। কিন্তু হায়, নয় করেই নয় হয়ে গেল।

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।

না, আমাদের ইন্দ্রজিৎ আছে। 'রাক্ষস ভরসা ইন্দ্রজিত মেঘনাদ অজেয় জগতে।' সে আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করবে।

কিন্তু এসেই সে যাই-যাই করতে লাগল। বুঝলাম এও বুঝি আয়ু থাকতেই বিদায় হবে।

'কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে।'

এবারও সিম্পসনের কলাকৌশল জয়ী হল। দেবদৈত্য নরত্রাস ইন্দ্রজিৎ পড়ে গেল ভূতলে।

তবু চন্দ্রশেখর আছে। বম্বে টেস্টের জয়ের যে আসল জাদুকর।

তুমি শুধু ধৈর্য ধরে থাকো আর বোরদে তার সোনার বরণ মার দেখাক।

'ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো, বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান।'

তা কতক্ষণ ধৈর্য দেখাবে? যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করতে গিয়ে সিম্পসনের বলে নিঃসম্বল হয়ে গেল।

তবু তারই মধ্যে দেখাল বোরদে। দেখাল দুঃখ করলেই দুঃখ আর ভয় করলেই ভয় বাড়ে। যে দুষ্প্রধর্ষ সাহসিকশেখর সেই করতে পারে অসাধ্যসাধন, সেই হতে জানে দিক-দিগন্তের অধিপতি। নইলে অন্তঃসারশূন্য খেলা খেলে লাভ কী?

মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না। আর মালা ফেরালেই হয় না বৈরাগী।

কী দেখাল সিম্পসন আর লরি? মারে-মারে ধুন্ধুমার। সব সময়েই খেলার মধ্য দিয়ে দেখি না, দেশের মধ্য দিয়ে দেখি, তাই ওদের গ্রাসে সুখী হই না, নাশেই সুখী হই। কিন্তু ব্যাটে-বলে, অচলে-চঞ্চলে, যখন যুদ্ধ বাধে তখন ওদের মধ্যে দেখি একজন দুদ্দাড় আরেকজন দুর্বার, আর আমাদের মধ্যে দেখি একজন ধুকধুক আরেকজন উসখুস।

মিড়মিড়ে পিদিম আর নিড়বিড়ে বউ ভালো নয়। তেমনি মিনমিনে ব্যাটও অকেজো। সাহসে ভজতে লক্ষ্মী সহায়ো বলবত্তরঃ।

তবু বোরদে যে শমীশাখার বক্ষ থেকে আগুন ডেকে এনেছে তার জন্যে তাকে বাহবা দিই। সবুজের উপর তার সোনার স্বাক্ষর নতুন করে আবার প্রমাণ করছে পলকের মাঝখানেই অনন্তের বাসা।

যতই দেখাও ভয় ছুঁড়ে মারো বিদ্যুৎ-রকেট
করব না কভু মাথা হেঁট,
খেলে যাব খেলে যাব রঙিন ক্রিকেট॥

অভুক্তের দিবানিদ্রা

রানের মত গান নেই। মারের মত বাহার নেই। আর যেমন সাজলে-গুজলে নারী, লেপলে-পুঁছলে বাড়ি—তেমনি মারলে-ধরলেই ব্যাট।

কিন্তু কী ছিল কী হয়ে দাঁড়াল।

অস্ট্রেলিয়ার ছয় উইকেটে ১৬৭ ছিল, সাকুল্যে ১৭৪ করে শেষ হয়ে গেল। ভাবুন এক ঘণ্টায় মোটে সাত রান। পর পর চার চারটে রথী কাত হল, জার্মান, ম্যাকেঞ্জি, সেলার্স আর কনোলি। এদের একজনও এই এক ঘণ্টায় একটা রানের আঁচড় কাটতে পারেনি। যে সাত রান এসেছে তা শুধু রেডপাথের ব্যাট থেকে।

এমন একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাব—চার-চারটে ব্যাট ফুটোর পর ফুটো হয়ে যাবে—এ ধারণার বাইরে।

কিন্তু যা ধারণার বাইবে তাই তো ক্রিকেটে ঘটে। জীবনেও ঘটে। আর বলতে গেলে জীবনই তো ক্রিকেট।

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপূজন। কিন্তু ক্রিকেটের বেলায় মাঠে দয়া রানে রুচি দর্শকপূজন। তাই আমাদের মঞ্জরেকার যখন রণে-রানে না গিয়ে স্যাকবার মত ঠুক ঠুক সুরু করল তখন অস্থির দর্শক চারদিক থেকে দুর্বার চিৎকার করে উঠল, কামারের মার চাই। তবু মারল কই মঞ্জরেকার? ব্যাটের বদলে পা দিল এগিয়ে। একেই বলে প'লো আর মলো। পপাত চ মমার চ।

কিন্তু সে কথা পরে।

সূচনাতে কত আশা নিয়ে খেলতে নামল সারদেশাই আর জয়সীমা। কী একটু বৃষ্টি হলেই খেলা বন্ধ, ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়লে খেলা বন্ধ, মেঘলা করে আলো একটু ঘোলা হলেই খেলা বন্ধ,

এমন সব টানা বেঞ্চি, বসলে পর আর বেরুবার পথ পাবে না, তবু চোখভরা আলো আর বুকভরা সুখ নিয়ে লোকে তাকাচ্ছে বোর্ডের দিকে, লাঞ্চস্কোর কাউকে না খুইয়ে পঁয়ত্রিশ। তবু লাঞ্চের পর সার-দেশাই যখন আউট হল তখনো মোট রান অভদ্র নয়—এক উইকেটে ষাট। কিন্তু দুরানি কীভাবে গেল বলুন তো। কথায় বলে মরণের ধরন নেই, একভাবে না আরেকভাবে গেলেই হল। থ্রম্বসিসও যা স্টেট বাস চাপা পড়ে থেঁতলে যাওয়াও তাই। আর সমস্ত মৃত্যুকেই কেমন যেন করুণ দেখায়! নইলে সাতান্ন বছর আঁটসাঁট হয়ে বাঁচবার পর অমন পাগলের মত কেউ মরে, যেমন সাতান্ন রান করে জয়সীমা আউট হল? কিংবা অমন অল্প বয়সে পরিপূর্ণ আশা নিয়ে, যেমন আউট হল দুরানি, মঞ্জরেকার আর হনুমন্ত? 'কেন এমন হল গো আমার এই নব যৌবনে?'

উদার হাতে দেদার মেরে যদি মরা যায় তো জীবন সার্থক। সারাক্ষণ ধূমায়িত হওয়ার চেয়ে কিছুক্ষণ প্রজ্বলিত হওযাও ভালো। কিন্তু দর্শন নেই শুধু পত্রে সম্ভাষণে কী হবে? বর্ষণ ছাড়া হর্ষণ কই?

'চিঠিতে কি ভোলে মন বিনা দরশনে?
শিশিরে কি ভিজে বন বিনা বরিষনে?'

ভারতীয় ইনিংসের গোড়াতে সিম্পসনকে বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। দিন খারাপ পড়েছে, ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ ফেলে দিয়েছে কতগুলি, তাই মাঠে নিজের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হনুমন্তকে ধরে যখন ভারতের পাঁচ উইকেট মাত্র ১২৯ রানে নিয়ে নিল তখন তাকে যেন উৎফুল্ল দেখলাম। এই তো ক্রিকেট। যাবৎজীবন তাবৎ চেষ্টা। যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।

ভারতের এই বিপর্যয় হল কেন? মাঠে ঐ একটা কুকুর ঢুকেছিল বলে? ১৯৫২ সালের লীডস টেস্টে ঐ একটা কুকুরই ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিল। মেঘলা দিন, ভিজে মাঠ, গোলাম

আমেদের বল ছুরির ফলার মত বেরিয়ে যাচ্ছে মাখনের মধ্য দিয়ে। গোলামের মুখোমুখি হাটনের হাতে ব্যাট—এমন সময় কুকুরের আবির্ভাব। সবাই মিলে কুকুরকে তাড়া করল, কিন্তু কুকুর কেবল ঘোরে, বেরিয়ে যায় না। সবাই ব্যস্ত কিন্তু হাটন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে, কুকুর তাড়াতে তার উৎসাহ নেই। কী করে হবে? যতক্ষণ কুকুর মাঠে থাকে, যতক্ষণ খেলাটা না হয়, তার লাভ, কেননা কে জানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলে রোদ উঠে পড়তে পারে। তাই হল, কুকুর তাড়াতে গিয়ে রোদ উঠে পড়ল। ফলে ভারতের ২৯৫এর উত্তরে ইংলণ্ড ৩৩৪ করে বসল।

কিন্তু এ কুকুর তো আমাদের ভারতবর্ষের কুকুর। হয়তো বা ছদ্মবেশী ধর্মরাজ। এ কুকুরকে মাঠ থেকে আমরা তাড়াইনি, পুলিশে তাড়িয়েছে। তাই পুলিশের যা হবার হোক, যুধিষ্ঠিরের পুণ্যে আমরা আমাদের সিদ্ধিফল পেয়ে যাব।

শুনেছি নিরাশা সুখদা। কিন্তু ক্রিকেটে নিরাশা বলে কিছু নেই। আজকের ফকির কালকে আমীর হয়ে যেতে পারে। আজকে যে কানন বিশীর্ণ সে কালকে হয়তো দাবানলের নৃত্য তুলে দেবে। ভাঙা নৌকোয়ও ভয় নেই। 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে, আমায় ভয়-ভাঙা এই নায়ে॥'

আজ যদি তেমন না জোটে থাকি উপোস করে। তবু দিবা-নিদ্রায় দোষ কী!

ক্রিকেটের নৈষ্ফল্য

'এ তো খেলা নয়, খেলা নয়, এ যে হৃদয়দহনজ্বালা !'

সত্যি করে বলতে গেলে, উদরদহনজ্বালা। বেলা তিনটে পর্যন্ত খেলা বন্ধ করে রাখার অর্থই হচ্ছে যাতে কিনা স্টলের খাবারগুলো বিক্রি হয়ে যায়। যাতে এক কাপ কফি বা এক খুরি চা-ও না পড়ে থাকে। দুর্ভিক্ষে পড়লে গোগ্রাসে গিলবে সবাই, দামের দিকে তাকাবে না। খেলা যখন বন্ধ, তখন খাওয়া ছাড়া আর কাজ কী।

খেলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ হবে না।

তাই স্টল-হোল্ডারদেরই পোয়া বারো। আমাদের গুদোম আগে সাবাড় হোক, তার পরে ঘোষণা করা যাবে আউটফিল্ডের জলের কথা।

কিন্তু যারা পাঁচ টাকার দৈনিক টিকিটে এসেছে তাদের অবস্থাটা ভাবুন। তাদের তো পাশ-আউটও নেই। তারা যে বাইরে বেরিয়ে হাত-পা একটু খেলিয়ে-ছড়িয়ে আসবে তারও উপায় নেই। বেলা দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তারা ঠাসাঠাসি করে বসে আছে, নট নড়নচড়ন, আর এমনই প্রহসন, তাদের সামনে মাঠভরা খটখটে রোদ, আকাশের প্রসন্ন আনুকূল্য। তাদেরকে, শুধু তাদেরকে কেন, পাঁচ থেকে একশো সবাইকে স্তোক দেওয়া হচ্ছে, লাঞ্চের পর আরম্ভ হবে, লাঞ্চের পর বলছে দুটোয়, দুটোয় বলছে টি-টাইমের পর। তারপর টি-টাইমে বলা হল, সরি, আউটফিল্ডে জল, খেলা হতে পারবে না, কাল আসবেন।

তা, জল তো সত্যি। আর ক্রিকেট তো ওয়াটার পোলো নয়।

দুই-ই সত্যি। কিন্তু নিয়তির প্রহসনটা দেখ। এলুমিনিয়মের

পাত দিয়ে তাঁবু সৃষ্টি করা হয়েছে পিচ ঢেকে রাখবার জন্যে। সকাল বেলা তাঁবু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, হয়তো'বা পিচেরই প্রয়োজনে, রোলার চালাবার তাগিদে, কিন্তু আয় তো আয় সেই সময়েই হেনে বৃষ্টি এল। তাঁবু আন, তাঁবু আন—ভাঁড় আনতে-আনতেই ষাঁড় পালাল—তাঁবু আনতে-আনতেই পিচের দফারফা। কী পরিহাস! জাগা ঘরেই চুরি হয়ে গেল। প্রকৃতি সমস্ত যান্ত্রিক আয়োজনকে কলা দেখাল!.

কতক্ষণের বা বৃষ্টি! তাতেই সোহাগিনী স্বর্গনন্দিনী মূর্ছাগতা। কত তাকে সেঁক-তাপ দেওয়া হচ্ছে, কত প্রবোধ-সান্ত্বনা, তবু অভিমানিনী গা তুলল না!

অথচ প্রভাতে কী কনকবরণ রোদ ছিল। কে বলে প্রভাতেই দিনের পূর্বাভাস লেখা থাকে! ঐ প্রভাতের দর্পণে কে দেখেছিল সমস্ত দিনের নৈষ্ফল্যকে! কে ভেবেছিল ক্রিকেট না দেখে সারা দিনমান আলো-ছায়া আশা-নিরাশার খেলা দেখে বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

মানুষ জপায় বিধি মাপায়। হয়তো এরই জন্যে জীবন আর ক্রিকেট সমানধর্মা।

অনেক গর্জন, বিন্দু বর্ষণ। আবার বিন্দুতেই সিন্ধু।

কিন্তু যা সেবাশুশ্রূষা করা হল সমস্ত তো ঐ পিচে, আউটফিল্ডে নয় কেন? তেমন করে নয় কেন? অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আদৌ নয় কেন? আর ওসব জল যদি সহজে না সরাবার মত হয় তবে লাঞ্চ-টাইমেই ঘোষণা করা হল না কেন, পিচ শুকোলেও আউটফিল্ড সারাদিনে শুকোবে না, সুতরাং আজকের খেলা বাতিল! তা হলে ব্যর্থ প্রতীক্ষার পরিশ্রম থেকে ত্রাণ পেত সকলে। হবে-হচ্ছে করে বসিয়ে রেখে ওবেলা আসিস বলে দিনের শেষে ক্ষুধার্তকে ভাগিয়ে দেওয়া, আর যাই হোক ক্রিকেট নয়।

না, না, সমস্ত ক্রিকেট। জীবনের সঙ্গে যা কিছু মেলে তাই

ক্রিকেট। কত বসিয়ে রেখে ভাগ্য শেষ মুহূর্তে ভাগিয়ে দেয় তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আর যাই হোক, ক্রিকেট দেখতে এসেছ তাই দেখে যাও। সারাদিনে একটাও উইকেট না পড়া, একটাও রান না করা, একটাও বল না ছোঁড়া, একটাও ব্যাট না নাড়া। এ এক আদর্শ ক্রিকেট। ব্যাটস্‌ম্যান নেই, ফিল্ডস্‌ম্যান নেই, আম্পায়ার নেই। আর চারদিকে বসে আছে হাজার-হাজার, প্রায় আধ লাখ দর্শক আর তাদের চোখে অভাবনীয়কে দেখবার লালসা।

মালি দুটো দাঁড়িয়ে আছে, সকলের আশা এই বুঝি পিচের মুখে চুন মাখাবে। এই বুঝি যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। যা কিছু আমাদের পরিক্লান্ত ও শ্রীহীন—এখুনিই তা সৌন্দর্যে লাবণ্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

শেষে কিনা আউটফিল্ডে জল! হায়, আশা আর ফুঁ-ই শুধু আছে, দুধও নেই বাটিও নেই।

বেশ তো ঐ আউটফিল্ডের জল কাজে লাগাও।

কতগুলো লোক চটে মটে অস্থির হয়ে চটে-বাঁশে আগুন লাগাল। কী আর করে! এতক্ষণ ধরে বরণসভা সাজিয়ে বসে আছে বরের দেখা নেই। একটা রঙচঙে কিছু না করলে দহন-জ্বালাটা বোঝানো যায় কী করে? মন্দ কী, এই আগুনেই তো ক্রিকেট, এই আগুনেই তো 'য়্যাসেজ'-এর জন্ম।

তবু ভারতীয় দর্শক তো নিরীহ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হলে বোতল ছুঁড়ত, একের পর এক, শয়ের পরে হাজার, সমস্ত মাঠটাই বোতলের স্তূপ হয়ে উঠত। আর তারা শুধু হেরে গেলেই প্রচণ্ড হয় না, রেডিওর ভাষ্যকার যদি অমনঃপূত কিছু বলে তারও উপর গিয়ে চড়াও হয়।

রেক্স আলস্টন ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দর্শকদের নিন্দা করেছিল, অমনি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানেরা কমেণ্টারি বক্স লক্ষ্য করে

তুমুল আক্রমণ স্থুরু করল। মন্দ হই তো হই, নিন্দে করবে কেন?

জর্জটাউনে মাঠে যখন প্রথম দাঙ্গা হচ্ছে, হাটন আম্পায়ার ব্যাজ মেনজিসকে বললে, 'খেলা চালিয়ে যান, এমন ভাব দেখান এ কিছুই নয়, কিছুই হয়নি।'

'তোমার কী!' বললে মেনজিস, 'তুমি তো চলে যাবে। কিন্তু আমি তো এখানে থাকব। ওবে বাবা, খেলা যদি বন্ধ না রাখি, তাহলে আমাকে আব এবা সশবীবে ফিবতে দেবে না।'

দর্শকেব মর্জিতেই ক্রিকেট। দর্শক যদি দেখতে না আসে তবে কোথায় খেলা। কোথায় বা পৃথিবীব জীবনাট্য?

আজ না হয় কাল হবে। প্রতিদিনই জন্মদিন। প্রতিদিনই আশাব জন্ম আশাব সমাধি।

এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা

মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। খেলা নেই। খাওয়া নেই। উল বোনা নেই। সাজ দেখানো নেই। আদ্যন্ত সব শেষ হয়ে গেল।

গলিতে স্লিপ করা নেই। পায়ের দিকে তাকানো বা লেগে গ্লান্স করা নেই। নেই ঢাকা জায়গায় ঢিল ছোঁড়া বা কভার ড্রাইভ করা। আর, আহা, কাটলেটকে ওদেব লেট কাট বলার কী দরকার।

'আউট! ক্যাচ আউট!' মহিলা লাফিয়ে উঠলেন।

'বাম্প বল।' কে আবেকজন সংশোধন করল।

সত্যিই তো আম্পায়ার আউট দিলে না। মহিলা হতাশ হয়ে গেলেন। সঙ্গের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কবলেন, 'বাম বল কী? বাম দল শুনেছি, এখানে আবার শুনছি বাম বল।'

'ও একই কথা।'. ভদ্রলোক সংক্ষেপে সারলেন।

সুধার হাটের বিকিকিনি শেষ হয়ে গেল।

শুনব না আর সেই ঝাড়ু মার, তাড়ু মার, সপাট মার, অপার মার। শুনব না আর সেই ব্যাটে-বলে শব্দ। সংসাবে বহু ধ্বনির মধ্যে এ একটা মধুর ধ্বনি, অনির্বচনীয়তার রস দিয়ে ভরা। যেমন আলাপে তেমনি প্রলাপে। যেমন সোহাগে তেমনি শাসনে। যেমন আদরে তেমনি প্রহারে।

লোহা জব্দ কামারবাড়ি, মেয়ে জব্দ শ্বশুববাড়ি, আর বল জব্দ ব্যাটের বাড়ি।

আর শুনব না সেই ছন্দে-ছন্দে কবিতার বিস্তার।

কত লোক বাজনা বায়না করেছিল, কত লোক বা বাজি, কত

জন বা গেঁথে এনেছিল ফুলের মালা, সব ভেস্তে গেল। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ যে গড়ের মাঠ, তার উপর আজ শ্মশানের শূন্যতা। স্বর্গোদ্যানে আজ শুধু বাঁশ তক্তা আর চটের হাহাকার। সারা বছরের ধুমধাম এক দিনেই ইতি।

সমস্ত মাঠ যেন শিবশূন্য মঠ, বিদ্যাশূন্য ভটচাজ।

সারা দিন হাতে বঁড়শি রেখে সন্ধ্যাবেলা আমড়া ভাতে দিয়ে ভাত খাওয়া।

তার চেয়ে বেশি।

গন্ধর্বনগরে বাস করলাম, মৃগতৃষ্ণিকার জলে স্নান করলাম, অমূল তরুর ছায়ায় বসে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে গলায় পরলাম। তারপর বাড়ি ফিরে এসে সোনার পাথর বাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব খেতে বসলাম।

তবু সমস্ত মিলে ক্রিকেট। তবু পাঁচ দিনের মধ্যে তিন দিন তো হল। বোরদে আর সিম্পসনের ব্যাট তো দেখলাম। দেখলাম তো অস্ট্রেলিয়ার চার-চারটে শূন্য। সেই বা কম কী! শূন্যের চেয়ে সামান্যও অসীম।

সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। হার-জিত যদি ক্রিকেট হয়, খেলা পরিত্যক্ত হওয়াও ক্রিকেট। শীতে-উষ্ণে সিদ্ধে-অসিদ্ধে স্থির ও নিরাসক্ত থাকাই তো ক্রিকেটের মর্মকথা। ধ্যানাসনে নিবিষ্ট, যোগাসনে দৃঢ় ও মন্ত্রসাধনে তৎপর হও আর ধ্রুবের দিকে লক্ষ্যকে তীক্ষ্ণ করে রাখো। ঈপ্সিত যার করগত হয়নি কর্মে তারই অধিকার।

একটা ওভার বাউণ্ডারি। একটা স্টাম্পকে উপড়ে বিশ হাত দূরে ছিটকে দেওয়া। এ রোমাঞ্চের জন্য বাঁচা চলে।

নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

স্টাম্পস ড্রন হল। তার মানে খেলা শেষ হল।

'স্টাম্পস ড্রন'-এর উপরে এখন একটা কবিতা শুনুন ঃ

'দ্রুত বল ছুটে লাগল যে দাঁতে
মাঠভরা ছিল বাম্প ;
হাঁ করিয়ে মুখ ডেন্টিস্ট এসে
তুলে নিল তিন স্টাম্প ॥'

অভাবিত ক্রিকেট

অনিশ্চয়ের রাজা ক্রিকেট। অঘটনের সম্রাট।

যা কিছু ঘটে যেতে পারে, যে কোনো সময়। পারের কাছে এসে হতে পারে ভরাডুবি। আবার উত্তাল নদী শুকিয়ে গিয়ে দিতে পারে পথ ছেড়ে। মানুষের জীবনের সঙ্গে এত মিল খায়। কখনো দিন বড় কখনো রাত বড়। কখনো সিংহাসন কখনো বনবাস।

কখনো নিরানব্বুয়ের পরে এক রান হয় না, কখনো আবার এক ইনিংসেই একজনের চারশো বাহান্ন রান। তার মানে কখনো ব্যাডম্যান, কখনো ব্র্যাডম্যান।

আর এই অভাবনীয়ের স্পর্শটুকু আছে বলেই ক্রিকেটে এত রস। হাতে ব্যাট মানেই কখনো হাতে চাঁদ, কখনো বা হাতে দড়ি। ক্রিকেটের প্রেম তাই বড়র প্রেম।

একান্নটা টেস্ট খেলে মোট ছ হাজার ন শো ছিয়ানব্বুই রান করেছে ব্র্যাডম্যান। শেষ টেস্টে সামান্য চার রান করতে পারলে তার এভারেজ বা গড়পড়তা একশো হয়। ওভ্যালএ খেলা, হোলিজ বল করছে। একটা চার মারলেই আকাঙ্ক্ষার ধন হাতে আসে। আর ব্র্যাডম্যানের পক্ষে চার মারা একটা বুলবুলির পক্ষে শিস দেওয়ার মতই সোজা।

কিন্তু ক্রিকেট ক্রিকেট। কালকের জমিদার আজকের উদ্বাস্তু হয়ে যেতে কতক্ষণ!

শেষ টেস্টে ব্র্যাডম্যান শূন্য। হোলিজ এর এক বলেই ঘায়েল। পরিষ্কার বোলড আউট।

হোলিজ-এর ফুর্তি দেখে কে!

ক্রিকেটে একজনের ঘর পোড়ে আরেকজন আগুন পোহায়।

, তারই জন্যে তো বুদ্ধ বলেছেন সংসারে কোথাও অবিমিশ্র সুখ নেই। আমার সুখ মানেই অন্যের দুঃখ। পরীক্ষায় আমার প্রথম হওয়া মানেই আরেকজনের দ্বিতীয় হওয়া। আমার চাকরি পাওয়া মানেই আরেকজনের না পাওয়া। ব্যাটস্‌ম্যান রান তুললে বউলারের মন খারাপ, যেহেতু তার এভারেজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তেমনি ব্যাটস্‌ম্যান আউট হয়ে গেলে বউলারের পৌষমাস। ব্র্যাড-ম্যান-এর আউটে হোলিজ-এর আনন্দ!

ব্যাট হাঁকড়ে বলকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাউণ্ডারির দিকে, মাটি-ঘেঁসা মার—আর হঠাৎ সেই তীর-গতি বলটা ফিল্ডস্‌ম্যান ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে মাটি না ছুঁয়ে, মুখ থুবড়ে গিয়েছে মাটির উপর, তবু বল ফেলে দেয়নি, বল-ধরা হাতটা ঠিক শূন্যে তুলে রেখেছে—এই দেখ একটা কামানের গোলাকে মোয়ার মত করে লুফে নিয়েছি। এ সন্ধান-সংযোগ বোধহয় সব্যসাচী অর্জুনের পক্ষেও কঠিন। আর উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে বল স্ক া‌ইকরে দিয়েছে, একেবারে ফিল্ডসম্যানের মুঠোর মধ্যে বল, নিষ্কর্মা শিখণ্ডিও সেটা ধরে রাখতে পারে, কিন্তু ফিল্ডসম্যান সেটা নাড়াচাড়া করতে-করতে ফেলে দিল মাটিতে। হিট করে রান নিতে ছুটে এল, আর পার্টনার স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে তাকে রান আউট করে দিল। তারপর তাগড়াই মার মারতে গিয়ে নিজেই হিট-উইকেট। আপনার ধনে আপনি চোর।

হাটন—হাটন কী করল, স্যার লিওনার্ড হাটন। প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসেই জিরো। উনিশ শো সাঁইত্রিশে, লর্ডসে, নিউ জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে। একুশ বছরের যুবক, স্বপ্নের রাজকুমার, কত তার কাছে ইংল্যাণ্ডের আশা। কেউ বলে হাটন যে ব্যাট ধরে যেন পাকা সার্জন সূক্ষ্ম মনোযোগে অপারেশন করছে। কেউ বলে, না, ডাক্তার নয়, বীণকার, ঘায়ে ঘায়ে সুরের লহর তুলবে আকাশে। দেখছ না কেমন স্নেহে আর শ্রদ্ধায় ধরেছে ব্যাটখানা। আর হাটন

নিজেও বলছে, হাতে ব্যাটের যে অনুভব তা বুঝি স্বর্গের চেয়েও রমণীয়।

সেই হাটন টেস্টে প্রথম আর্বিভাবে শূন্য!

ডোলভরা আশা কুলোভরা ছাই।

আচ্ছা, সেকেণ্ড ইনিংস দেখা যাবে। একবার না পেরেছে তো কী হয়েছে, দ্বিতীয় ইনিংসে আগুন ছোটাবে। একবারকার রুগী আরবারকার রোজা হবে। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরে ক্রিকেটের কেরামতি দেখ।

যেমন কেরামতি তেমনি কারসাজি।

দ্বিতীয় ইনিংশে হাটন এক করল। এক গালে চুণ ছিল আরেক গালে কালি মাখাল।

তা কী করা যাবে। এই তো ক্রিকেটের রসরাগ।

সেই শূন্যেরও মূল্য অপরিসীম। পররর্তীদের কাছে অভয়-প্রদীপ। মানে, কখনো আশা হারিও না, দাঁড় টেনে যাও, দাঁড় টানতে টানতেই পাড়ি জমে যাবে।

তাই সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ব্যারিংটন যখন শূন্য করল তখন দেহে-মনে চুরমার হয়ে গেলেও ব্যারিংটন এই আশাতেই আশ্রয় খুঁজল যে হাটনও তো প্রথম টেস্টে জিরো করেছিল। যদি অফুরন্ত কিছু থাকে তবে এই ক্রিকেট। এই ক্রিকেটেই সমস্ত অপুরন্তকে অফুরন্ত করে তোলা যায়। আচ্ছা, সেকেণ্ডে ইনিংস আছে। সেকেণ্ড ইনিংসে নিশ্চয়ই হাটনের চেয়ে বেশি করব। ভগবান, চার না হোক, অন্তত একখানা দুই।

হায়, সেকেণ্ড ইনিংস খেলবার সুযোগই এল না সেবার। প্রথম ইনিংসের স্কোরেই ইংলণ্ড জিতে গেল।

ব্যারিংটন মুখ আলো করতে পারল না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, দ্বিতীয় টেস্টেও সে নির্বাচিত হল। বোর্ডে তিন উইকেট হারিয়ে তিরিশ, লর্ডস মাঠে নামল ব্যারিংটন, গার্ড

নিল। বুক ধুক ধুক করছে, এবারও না জিরো করে। তাহলে কী অপূর্বই না হবে। ছু ছুন্নার গোলবদন। তারপরে আর এমুখো নয়, মাঠে আর ব্যাট না চালিয়ে লাঙল চালানো!

কী হল কে জানে। বলটা পড়তেই ব্যারিংটন ব্যাটটা সামনের দিকে ঠেলে দিল।

একটা সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ। বলটা যে কী ব্যবহার করল, কোন দিকে গেল, উত্তরে না দক্ষিণে, বুঝতেও পারল না—শুনতে পেল করধ্বনি। কী ব্যাপার? ফিল্ডস্‌ম্যান শুয়ে পড়েও সে বল ধরতে পারেনি, বিদ্যুৎগতিতে চলে গিয়েছে বাউণ্ডারি পেরিয়ে।

পৃথিবীতে এমন কোনো নৃত্যগীতবাদ্য নেই যা ঐ হাততালির মত মধুর হয়ে ব্যাটসম্যানের কানে বাজে।

তাই, ক্রিকেটই তো বলে, নিরাশ হয়ো না, আর যখন দেখছ ঘোরতর বিপদ, ব্যাটটা সামনের দিকে ঠেলে দাও।

পিটার মে-ও অমনি সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারও প্রথম টেস্ট সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে, লীডসে। প্রখর রোদ, মাঠে সাইটস্ক্রিন নেই, শাদা শার্ট আর ফ্রক চারদিকে ঝকঝক করছে, রাউয়ানের বল-এর বিন্দুবিসর্গও সে দেখতে পেল না। তার মনে পড়ল ক্রিকেটের সেই মূলমন্ত্র, যখনই সংশয়ে বা বিপদে পড়বে তখনই ব্যাটটা ঠেলে দেবে।

মে-ও সামনের দিকে ব্যাটটা ঠেলে দিল।

আহা, ব্যাটে-বলে সংঘর্ষ হয়েছে আর বিতাড়িত বল পলকে চলে গিয়েছে সীমাতিক্রান্ত হয়ে। প্রথম টেস্টে প্রথম বলেই মে-র চার।

জীবনেও সেই ক্রিকেটের মন্ত্র। ভগ্নোৎসাহ হয়ো না। অপার দুস্তারেও ব্যাটটা সামনের দিকে ঠেলে দাও। ঘাঁটি ছেড়ো না। তালে ভঙ্গ দিও না। শুধু গড়িয়ে চলো। শুদ্ধ যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে তুল্য ভাবো।

সেই লীড্‌সে চতুর্থ টেস্টম্যাচ হচ্ছে ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার। ইংল্যাণ্ডের ক্যাপটেন হাটন আর অস্ট্রেলিয়ার হ্যাসেট। টসে এবারও হ্যাসেট জিতল। জিতে এবার সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল, ইংল্যাণ্ডকে বললে ব্যাট করতে। কোনোদিন এমন কাণ্ড হয় নি, এযাবৎ টসজেতা পক্ষই আগে ব্যাট করেছে। হ্যাসেটের সিদ্ধান্তে হাটন ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তার ঘাবড়াবার আরো এখনো বাকি আছে। ওপন করতে এসে হাটন দেখল লিণ্ডওয়ালের দ্বিতীয় বলেই তার মিডল স্ট্যাম্প উড়ে গিয়েছে।

সে-খেলা দেখতে এসেছিল হাটনের স্ত্রী, হাটনের স্কুলে-পড়া ছেলে রিচার্ড। স্ত্রী না হয় স্বামীর অপমান ক্ষমা করে নেবে, কিন্তু রিচার্ড? আর, রিচার্ড তো খেলা দেখতে একা আসেনি, সঙ্গে তার স্কুলের বন্ধুরাও এসেছে। এ যে তার নিজের লজ্জা, নিজের অপমান। রিচার্ড অঝোর চোখে কাঁদতে লাগল। কে তাকে সান্ত্বনা দেবে, আশার কথা শোনাবে?

মনে হয় সব যেন মুছে গেল। আকাশে যেন আলোর শেষ কণিকাটিও অস্ত গেছে। কিন্তু না, কিছুই যায় না নিঃশেষ হয়ে। এই হাটনই শেষ পর্যন্ত টেস্টে তিন শো চৌষট্টি করল। আর উনিশটা সেঞ্চুরি। ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত ঐ ৩৬৪ই সর্বোচ্চ রান ছিল। পরে গারফিল্ড সোবার্স এসে তিনশো পঁয়ষট্টি করলে। আর হাটনের ৩৬৪ যদি তেরো ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে, সোবার্সের ৩৬৫ দশ ঘণ্টায়।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

তারপর আম্পায়ারের ভুল আছে না? কী হল গত বছরের ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজে? ট্রুম্যানের বল ওরেলের খোলা হাতে লেগে উইকেট-কিপার পার্কসের হাতে ঢুকল। হাউ? আম্পায়ার লরি গ্রে নির্দ্বিধায় ওরেলকে আউট দিলে। বোঝা গেল ওরেল অসন্তুষ্ট হয়েছে। একবার ক্রিজে দাঁড়িয়ে আরেকবার প্যাভিলিয়নের দিকে যেতে যেতে সে তার অসন্তোষ প্রকাশ করলে। আম্পায়ারের

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, যতই তা অমনঃপূত হোক, অসন্তোষ প্রকাশ করাটাই অসন্তোষজনক। জীবনে যে ভালো খেলোয়াড় সে কখনো ভাগ্যের বিধানের বিরুদ্ধে বিরক্তি দেখায় না। সে মেনে নেয়, সে খেলে যায়। বিগতজ্বর হয়ে যুদ্ধ করে।

খেলার মাঠে যেমন তেমনি জীবনেও জটিলা-কুটিলা এসে জুটবে। 'জটিলে কুটিলে না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না।' ধরা আর ছাড়া, ছাড়া আর মারা জীবনের মত ক্রিকেটেরও একই লীলা। আর তা আছে বলেই জীবনের মত ক্রিকেটও দেবতাব কাম্য।

তাই তো, কে কবে শুনেছে, একটা টেস্টে সাত সাতটা সেঞ্চুরি উনিশ শো আটত্রিশে, ট্রেন্ট ব্রিজে। ইংলণ্ডের পক্ষে কম্পটন ১০২, আর পেইণ্টার ২১৬ আব অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ম্যাকক্যাব ২৩২, ব্র্যাডম্যান ১৪৪, ব্রাউন ১৩৩।

আবার এই ক্রিকেট মাঠেই দেখতে পেলাম ভারতবর্ষের কীর্তি, চার উইকেটে শূন্য। কিন্তু আবার দশম উইকেটে ভারতবর্ষের সারভাতে আর সুঁটে ব্যানার্জি মিলে ছুশো উনপঞ্চাশ রান।

এই তো ক্রিকেটের তাৎপর্য। অভাবনের মহিমা।

"কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।"

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে

রানের মত গান নেই। মারের মত বাহার নেই। আর, সেই চাতুরীই চাতুরী যাতে মারও হয় রানও হয়।

ইডেন গার্ডেন কত কী উপহার দিল এবার, নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই দ্বিতীয় টেস্টে। আর, সন্দেহ কী, একমাত্র ক্রিকেটই যোগাতে পারে পরমাশ্চর্যের স্পর্শ। একমাত্র ক্রিকেটের হাতেই আলাদিনের প্রদীপ।

চার দিনের খেলা। তার মধ্যে দশ-দশটা ওভারবাউণ্ডারি। প্রথম দিনে চারটে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে তিনটে করে। প্রথম দিনেরটা ওদের দলপতি রীডের উপহার, দ্বিতীয় দিনেরটা টেলরের আর শেষ দিনে ব্যাটকে আহ্লাদে আটখানা করে তুলল জি ই ভিভিয়ান, ওদের দলের তরুণতম খেলোয়াড়, বয়েস আঠারো সবে ছুঁয়েছে। রীডের চারটে লাঞ্চের আগেই, টেলরেরও তাই, আর ভিভিয়ানেরটা দ্বিতীয় ইনিংসে সামান্য এক শো তিন রানে সাত উইকেট পড়ে যাবার পর। এ তো আটটার হিসেব। আর বাকি দুটো?

বাকি দুটো আমাদের। একটা ইঞ্জিনিয়ারের আরেকটা দুরানির। আমাদের দুটোও শেষ দিনে, দ্বিতীয় ইনিংসে। আমাদের যদি একটাও না হত তা হলে যে মুখরক্ষা হত না। এমনি অক্কা তো পাবই, অন্তত একটা ছক্কা করে অক্কা পাই।

সর্বক্ষণ বলেছি, হে ছক্কা, তোমার আবির্ভাবের দ্বারা আমাদের ব্যাট ধন্য হোক, আমাদের মাঠ পুণ্যপরিপূর্ণ হোক, আমাদের চিত্ত নিষ্পঙ্কনির্মল হয়ে উঠুক।

ভাবুন দশ-দশটা ছক্কা! ইডেনের কাষ্ঠাসনে বসে দেখেছেন আর কোনো দিন?

মাস্টার এসে শেখালে ব্যাটসম্যানকে যে এমনভাবে মারবে বল যেন মাটি আঁকড়ে ছোটে, এক চুলও না ওঠে, আর নিজের ক্রিজ যেন ছেড়ো না। ছাত্র বললে তথাস্তু। শেষে মাস্টার কাণ্ড দেখে হায়-হায় করে উঠল। ছাত্র ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বল শূন্যে হাঁকড়েছে, আর দেখ একটা অগাধ ছক্কা উঠেছে আকাশে।

রীড তো ক্যাপটেন, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, দশ বছর আগে যখন এসেছিল টেস্ট খেলতে, কলকাতায় একটা, দিল্লিতে আরেকটা সেঞ্চুরি করেছিল। কিন্তু টেলর কে ? ওকে তো গোড়ায় টিমেই নেওয়া হয়নি। বার্টলেট আসতে পারল না বলে ওকে ডাকা হল শূন্য পূরণ করতে। প্রথম টেস্টে, মাদ্রাজে, ও অন্তর্ভুক্ত হল না। দ্বিতীয় টেস্টে কলকাতায়ও ও বাদ পড়ছিল। শেষ মুহূর্তে সিনক্লেয়াব অসুস্থ হয়ে পড়ল বলেই ও গোঁজামিল দিতে এল।

প্রথম অবতরণেই সেঞ্চুরি করল টেলর, ১০৫—ছোট এক টুকরো অঙ্গার থেকে বৃহৎ অগ্নিব জাগবণ ঘটাল। শুধু তাই নয়, ফাস্ট বল করে ভারতের পাঁচ-পাঁচটা উইকেট নিলে।

তবু তার যখন মোটে একুশ বান বালু গুপ্তে তাব একটা আলু-ভাতে ক্যাচ ফেলে দিল। বলা যাক বালুসাৎ কবে দিল।

ফেলতেই হবে। টেলবেব দক্ষিণ হস্তেব দৃঢ় মুষ্টিকে বদান্য ক্রিকেট বরেণ্য করতে এসেছে।

কিন্তু আমরাও তো ভাগ্যবঞ্চিত নই। শনিবারের শেষ বেলায় নাদকার্নি শূন্যের শেষ আর্তনাদ তুলে বিদায় নিলে। একটা বল বাকি টেলবেব, সেটা ববিবাবের সকালে ব্যয় করতে হবে। আর সেই বলেই স্লিপে ক্যাচ তুললে পাটাউডি। তখন জার্ভিস সার্ভিস করতে আসেনি, পোলার্ড নাগালের মধ্যে পেল না। পাটাউডি বেঁচে গেল।

বাঁচতেই হবে। মজার রাজা ক্রিকেট, সেই বাঁচিয়ে দিল। নইলে সাটক্লিফের ১৫১-র প্রত্যুত্তরে ভারতের পক্ষে ১৫৩ করে কে ?

নবাবপুত্তুরের মত খেললে না, খেললে দিকদিগন্তের অধীশ্বরের মত। চারদিকে আনন্দের হোমহুতাশন জ্বালিয়ে দিলে। ভাবছিলাম একটা যদি ছক্কা ওঠে! কিন্তু না, সাটক্লিফ তো ছক্কা মারেনি। দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে তেমনি করেই খেললে পাটাউডি। সঙ্গে বোরদে, নৈরাশ্যবিজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠার যে প্রতিমূর্তি।

মাদ্রাজ টেস্টে ভারত ৮২ রানে এগিয়ে ছিল, কলকাতা টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড সেই ৮২ রানেই এগিয়ে রইল।

এ ক্রিকেটের আরেকটা মজা।

আরো মজা দেখুন। মাবমুখো পাটাউডি টেলরের বলে তার উইকেটের সামনে উঁচু ক্যাচ তুলেছে। উইকেটকিপার ওয়ার্ড ছুটেছে ধরতে, হয়তো ওটা ওরই এলাকা, আর এদিকে অত্যুৎসাহী টেলারও ছুটেছে যাতে না কিছুতেই ফসকায়। ত্বজনে প্রবল সংঘর্ষ হল, ত্বজনেই পড়ল মাটিতে, কিন্তু ধ্রুবের দিকে যাব স্থির লক্ষ্য সেই ওয়ার্ড ভুল করল না, বল ঠিক মুঠোর মধ্যে ধরে রাখল। এমন সংঘর্ষও ঘটতে দেখিনি ইডেনে, ঘটলেও বল ছিটকে পড়ত মাটিতে, ব্যাটসম্যান আউট হত না।

আমাদের বেলায় কী হল?

একশো তিন রানে শেষ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ওদের সাত-সাতটা উইকেট পড়ে গেছে। ত্বর্ধর্ষ রীড আর সাটক্লিফ যথাক্রমে ১১ আর ৬ করে আউট। ভিভয়ান আর পোলার্ড খেলছে। ভিভিয়ান ক্যাচ তুললে। বালু গুপ্তে আব রাঘবন ত্বজনেই ছুটল—কে ধরে কে ধরে! পরস্পর পবস্পবের মুখের দিকে তাকাল—সংঘর্ষ হওয়া দূরের কথা, কেউই বল ধরতেই হাত বাড়াল না।

সেটাও একটা আলুভাতে ক্যাচ। আর সেটা যদি ধরা পড়ত, তাহলে ভারতের আকাশে জয়াদিত্য দেখা দিত আরেকবার।

তারপর বল করে চারের পর চার দিয়ে সব মেছমার করে দিল

বালু। রাঘবনকে সরিয়ে ওকে যে কেন বল করতে দেওয়া কে বলবে। ব্যাটে-বলে যার ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই, ফিল্ডিংএও যে নিধিরাম, তাকে ডাকা কেন? মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট।

বেশ একটা ছায়া পড়েছিল ওদের মাঠে, কিন্তু সেটা তাল পাতার ছায়া—ক্ষণস্থায়ী।

তবু ইঞ্জিনিয়ার বলে-বলে বলবত্তর হয়েছে এই আনন্দে সমস্ত মালিন্য মুছে দিয়েছি। প্রথম ইনিংসে আস্তাবুড়ি মার মেরে দশ করে আউট হয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়ে প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। তাও যত রান তার চেয়ে কম মিনিটে। ওর হচ্ছে প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা। ও মাঠের চুল আঁচড়ায় না, ও শুকনো কাঠে সুরের আগুন ঝরায়।

জয়-পরাজয় না হোক তবু আনন্দে-সৌন্দর্যে এ খেলা। প্রাণময় সূর্যোদয়ের খেলা।

মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সে বীর্যের পরিচয় দিয়েছে পাটাউডি, বোরদে, হনুমন্ত, ইঞ্জিনিয়ার।

হালও ধরো, পালও তোলা। নিজেও বাড়ো, দলকেও জেতাও —দুর্গম দুরত্যয় পথে বিজয় রথ চালিয়ে নাও।

প্রাণের জিনিস রান। তাই রান-গানে সদারুচি। শুধু নিজের গৌরব নয়, স্বদেশের সম্মান। শুধু নিজের সেঞ্চুরি নয়, দলের সাফল্য, দেশের সমৃদ্ধি।

বাদুড়বাগান থেকে মোহনবাগান

'তোমার যখন এত সখ, চলো তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

'চলো', মীরা খুশিতে উছলে উঠল : 'কিন্তু একটা কথা।'

'কী ?' রজত তাকাল মুখের দিকে।

'আমি তো আনাড়ি, অনেক হয়তো বোকার মত প্রশ্ন করে বসব, তুমি কিন্তু বিরক্ত হতে পারবে না।' চোখে শাসনের ঝলস আনল মীরা : 'বরং চুপ করে থাকবে।'

'সে কী ? বোকার মত প্রশ্ন করে-করেই তো লোকে বুদ্ধিমান হয়।' সহানুভূতির সুর আনল রজত : 'তুমি আর কী আনাড়ি ! সেই আফ্রিকার হাতুড়ে ডাক্তারের গল্প জানো ?'

নিরক্ষর চোখ তুলে তাকাল মীরা।

'হাতুড়ে ডাক্তার মানে উইচ-ডাক্তার, আমাদের দেশের যেমন ভূতপ্রেতের ওঝা, সেই-জাতীয়। ইংলণ্ডে প্রথম খেলা দেখে ফিরে এসে গল্প করছে। সে কী বিরাট ঝাড়ফুঁক দেখে এলাম ভাই। সেটা ঘটে মাঠে, খোলা মাঠে, হাজার-হাজার লোক তাতে যোগ দেয়। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে ওঠে আর শাদা কোট গায়ে দুটো লোক পাশাপাশি হেঁটে মাঠে নামে। মাঠে নেমে মাঝবরাবর তিনটে কাঠি পোঁতে। কিছু দূরে আরো তিনটে কাঠি। তারপর একসঙ্গে এগারোটা লোক, পায়ে বুট, পরনে শার্ট-ট্রাউজার—সব ধবধবে শাদা—নেমে প'ড়ে, আগে-পিছে, যার যেমন খুশি, দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর, জানো, আরো দুটো লোক আসে, তেমনি শাদায় সাজা বটে, কিন্তু হাতে-পায়ে প্রচুর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ থাকলে কী হবে, হাতে আবার একটা করে কাঠের মুগুর। দুটোর একটা গিয়ে দাঁড়াল একদিকের তিন-কাঠির সামনে, আরেকটা আরেক

দিকে, তিন-কাঠির পাশ ঘেঁষে। তখন সেই শাদা কোট পরা একটা লোক তার পকেট থেকে একটা লাল গোলা বের করে এগারো জনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে তার হাতে দিয়ে দিল। সেই লোকটা নিজের হাতের তালুতে একগাদা থুতু ফেললে আর সেই থুতুতে লাল গোলাটা খুব করে চটকালে। তাতেও হল না। তারপর সেই লাল গোলাটা ট্রাউজারে ঘষলে, শার্টে ঘষলে, ঘষে-ঘষে শার্ট ট্রাউজার লাল করে ফেললে। তারপর যে লোকটা তে-কাঠির সামনে দাঁড়িয়েছিল মুগুর নিয়ে, তাকে লক্ষ্য করে প্রাণ-পণ জোরে ছুঁড়লে। তাবপর? তারপরই ঝমঝম ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল—উঃ, সে কী বৃষ্টি, আর তক্ষুনি মাঠের সেই এগারো প্লাস দুই প্লাস আরো দুই—পনেরোটা লোক ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল মাঠ ছেড়ে। মানেটা বুঝলে তো? ঐ ব্যাপারটা আর-কিছু নয়, বৃষ্টি নামাবার ঝাড়ফুঁক। কিংবা, বলতে চাও বলো, তুকতাক। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হবে না তখন আমরাও এ তুকতাকটা কবলে পারি। শুধু পনেরোটা লোক, তিন-তিন ছটা কাঠি আর একটা লাল গোলা। ম্যাজিক হে ম্যাজিক। বৃষ্টি নামাবার অভ্রান্ত উপায়।'

এতটা আনাড়ি নয় এমনি সাহসে হাসল মীরা। মাঠের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কি, ওবা দেখি নামল ফিল্ড করতে।'

'হ্যাঁ, রিচার্ডসন টসে জিতে ভারতীয়দেরই ব্যাট করতে ডেকেছে।'

'ভালোই হল। আমাদের ব্যাটিং দেখব। আচ্ছা সোবার্স কোনজন?'

'সে হবেখন। তার চেয়ে বলো তো টসে জেতার মানে কী?'

'আহা, তা কে না জানে।' চোখে ঝিলিক দিল মীরা: 'মাথা না ল্যাজ, এপিঠ না ওপিঠ, উপুড় না চিৎ—এই তো?'

'খুব বুঝেছ।' রজত তাচ্ছিল্যের ভাব করল: 'বেশ, বলো তো টেস্টম্যাচে উপরোউপরি টস জিতেছে কে বেশি?'

'তা আমি কী করে বলব ?' মীরা ঠোঁট ফুলোলো।

'সে এই মাঠে উপস্থিত আছে।'

'কোথায় আমি প্রশ্ন করব, না তুমি করছ!'

'সে কলিন কাউড্রে। ঐ যে স্লিপে দাঁড়িয়ে আছে। সাতটা টেস্টে পর-পর টস জিতেছে—১৯৬০ সালে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচবার আর পরের বছর ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুবার—'

'ওসব স্ট্যাটিস্টিকসে আমার দরকার নেই।' মীরা অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'তার চেয়ে দেখিয়ে দাও সোবার্স কোন জন ?'

'সোবার্সকে আবার দেখিয়ে দিতে হয় নাকি ? ছ ফুট লম্বা আটাশ বছরের সুন্দর কালো মানুষটাকে খুঁজে নিতে পাচ্ছ না ? বেশ, দেখিয়ে দিচ্ছি, 'সোবাব' হয়ে বসো, তার আগে বলো তো তিন ডব্লিউ কী-কী ? জানো ?'

'জানি।' অনেক মাথা খাটিয়ে নিচু গলায় মীরা বললে, 'মদ, স্ত্রীলোক আর দুশ্চিন্তা।'

'ওয়াইন ওম্যান আর ওয়ূরি—' হা হা হা করে হেসে উঠল রজত, 'মোট্রেও তা নয়। তিন ডবলিউ হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন ঝানু ব্যাটসম্যান—ওয়ালকট্, উইকস আর ওরেল।'

'তাই বুঝি ?' নির্দোষ শিশুর মত মুখ করল মীরা।

'তেমনি তিন এইচ বলতে পারো ?'

'পারি।' এতটুকু ঘাবড়াল না মীরা: 'হনুমান, হনলুলু আর হনিমুন।'

'তোমার মুণ্ডু।' বললে রজত, 'তিন এইচ মানে ইংলণ্ডেব তিন সেরা ব্যাটসম্যান—হবস, হ্যামণ্ড আব হাটন। আরো তিন দেশ থেকে তিন হ নিতে পারো, অস্ট্রেলিয়ার হ্যাসেট, ভারতবর্ষের হাজারে আর পাকিস্তানের হানিফ।'

'খেলা দেখ।' গম্ভীর হতে না হতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল মীরা: 'এবার ঐ তো ঐ সোবার্স বল করছে। তাই না ? স্লো বল।'

'হলকে দেখেছ ?'

'প্রত্যেক বছরেই তো পরীক্ষার হলে দেখছি।' আতঙ্কগ্রস্ত মুখ করল মীরা।

'সেই হলের বলেই তো কাউড্রের হাত ভাঙল। শোনো', রজত দীপ্তকণ্ঠে বললে. ব্যাটসম্যান তিন ডবলিউ হোক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বউলার কিন্তু পাঁচজন। হল, গ্রিফিথ, গিবস, সোবার্স আর—'

'আর—' ভাবতে চেষ্টা করল মীরা।

'আর, আবার সোবার্স। সোবার্স দুবার। ফাস্ট, মিডিয়ম, স্লো—তিন রকমই যে বল করতে পারে। আর ব্যাটে যে সর্ববাদ্য-বিশারদ। ব্যাট তার হাতে কখনো চাবুক কখনো তলোয়ার কখনো গদা। ভাবতে পারো টেস্ট ম্যাচে চার হাজারের উপর রান করেছে আর উইকেট নিয়েছে প্রায় একশো। সর্বোচ্চ টেস্ট রান-এর রেকর্ডও তারই—৩৬৫—কারু সাধ্য নেই এত সব অতিক্রম করে। তারপর ফিল্ডিং ? এডিলেডে চার দিনের খেলায় সেকেণ্ড ইনিংসে তিনশো আশি মিনিটে দুশো একান্ন রান করে সাঁইত্রিশ ওভারে একশো তেইশ রান দিয়ে নটা উইকেট নিয়ে পরদিন সকালে প্লেন চাপলে। একটানা বাষট্টি ঘণ্টা ফ্লাই করে যখন দেশে এসে পৌঁছুল তখন ভারতের সঙ্গে খেলা শুরু হতে আর মোটে ঘণ্টা তিনেক বাকি। বিশ্রামের সময় নেই, এয়ারপোর্ট থেকে সটান মাঠে চলে এল আর মাঠে নেমেই শ্লিপে ক্যাচ ধরে কণ্ট্রাক্টার আর উমরিগরকে পর পর ফেরত পাঠালে।

'কী শক্তি ! কী স্বাস্থ্য !' মীরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'আসল হচ্ছে আনন্দ ! জীবনের সমস্ত ব্যঞ্জনের নুন। আসল হচ্ছে ক্রিকেটকে ভালোবাসা। আরেকবার কী হল শোনো ! সেবারও ইংলণ্ড থেকে প্লেনে করে এসেছে দেশে, এম সি সি-র বিরুদ্ধে খেলবার জন্যে। ট্যাক্সি করে যাচ্ছে মাঠের দিকে, হঠাৎ রাস্তায় কতগুলো খালি-পা ছেলে গাড়ি আটকাল—আমাদের সঙ্গে খেলবে

এস। একটা কেরাসিন টিন হচ্ছে উইকেট, কি একটা গোলাকার বস্তু বল আর একখানা চেরা তক্তা হচ্ছে ব্যাট। সেই ছেলেদের সঙ্গেই খেলায় মেতে গেল সোবার্স।'

'আচ্ছা বুচার কোনজন ?' মীরা আবার উৎসুক।

'সে ওদের ব্যাটিং-এর সময় বুঝতে পারবে। কী রকম বুচারি করে দেখবে তখন।'

'কী নাম রে বাবা!'

'তার আগে তো বার্বার এসেছিল। টেলার এসেছিল। কসাই ক্ষৌরকার দর্জি কেউ বাদ যায়নি। হকার-সেলারও এসে গেছে। আমাদের মার্চেন্ট কন্ট্রাক্টার ইঞ্জিনিয়র এ সবের চেয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত। ওদের শুনতে পাই কবলার-কার্পেন্টারও আছে। কিন্তু যাই বলো ওদের একজন নার্স আছে, আরেকজন আছে ডার্লিং। আমাদের সবেধন এক মঞ্জু। আচ্ছা, কী বলে ও তুই করে আউট হল বলো তো।'

আমার ক্যাপটেনই বা কী করল!'

'কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বম্বে টেস্টটা জিতিয়ে দিলে তো!' রজত হতাশ মুখে বললে, 'এমনিতে রান আর উঠবে না, এখন একস্ট্রাই যা সম্বল। কি, একস্ট্রা বোঝ তো ?'

মৃদু হেসে মীরা বললে, 'সেই স্কুলে জিওমেট্রিতে যা পড়েছিলুম।'

'কত পড়েছিলে তা জানা আছে। একস্ট্রা হচ্ছে ফাউ, ফালতু। দুজনে মিলে সুখে-শান্তিতে থাকবে বলে বাসা নিল, কতগুলো একস্ট্রা এসে জুটলো।'

'বাজে কথা বোলো না। খেলা দেখ।' মীরা রজতের হাতটা ঠেলে দিল : 'দেখ না এবার কে বল করছে।'

'মস্তাক।' রজত সংক্ষেপে বললে।

'কে মস্তাক ? মস্তাক আলি ?'

'মস্তকে কিছুই নেই—নামটাও ঠিক বলতে পাচ্ছ না।'

'বলছি।' মীরা চোখের পাতা নাচাল: 'মস্তাক আহম্মদ।'

'তোমার মুণ্ডু। মস্তাক আহম্মদ তো ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ব্যাক। এ হচ্ছে মস্তাক মহম্মদ, হানিফের ছোট ভাই। তের বছর বয়সে ফার্স্ট ক্লাশ ক্রিকেটে নেমে সাতাশি করে আর আটাশ রান দিয়ে পাঁচটা উইকেট পায়। তোমাকে বলছি কী, মস্তাক আবার লেগ-স্পিনার। পনেরো বছর বয়সে টেস্ট খেলতে নামে আর সতেরো বছর বয়সে টেস্ট-সেঞ্চুরি করে। এসব রেকর্ড তোমার নোট বইয়ে লিখে রাখো। আজকাল ব্যাটে-বলে-ফিল্ডে অল-রাউণ্ডার হওয়া দরকার, যেমন তুমি হয়েছ গানে-বাজনায়-লেখাপড়ায়। অল-রাউণ্ডার হতে না পারলে আজকাল বিয়ে নেই মেয়েদের।'

'তোমায় বলেছে! কিন্তু আমি বলছি,' মীরা ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল: 'তুমি বোরদে-তুরানির বাউণ্ডারির মার দেখে উত্তেজিত হবে না?'

'ওরে বাবা, কথায়-কথায় বাউণ্ডারি—তুরানি তো এসেই পর-পর সাতটা চার মারলে আর বোরদের তো লেখা-জোখা নেই। হাত-তালি দিতে-দিতে হাতের তেলো লাল হয়ে গেল। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না কোথায় একটু ভেজাল আছে।'

'ভেজাল?'

'মানে, হার-জিতের কোনো মূল্য নেই তো—সমস্তই একটা উৎসব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তাই মারবার মত বল দিচ্ছে, ধরবার মত ফিল্ডিং করছে না। হত এটা একটা টেস্ট ম্যাচ, কেরদানি বেরিয়ে যেত—সানাই বাজাতে হত না।'

'না, না, উৎসবই ভালো।' মীরা চোখ উজ্জ্বল করল: 'উৎসব বলেই তো আমরা এসেছি, আসতে পেরেছি।'

'তাই। এরা বলছে তোমরা খেল্ দেখাও, ওরা বলছে তোমরাও দেখিও সময়মত।' রজত বিরসস্বরে বললে, 'ঐ যে বলছি ব্যঞ্জনে সব উপাদান আছে, নুনটুকু নেই, কবিতার শব্দের সমারোহ আছে,

ভাবের গৌরব আছে কিন্তু আন্তরিকতাটুকু নেই। নইলে দেখ দেখ, ডলি-টা কেমন মিস করল!'

'ডলি এখানে এল কোত্থেকে?' চোখ প্রায় কপালে তুলল মীরা।

'এ তোমার লিলির বোন ডলি নয়। ডলি মানে ডলি-ক্যাচ।'

'ডলি-ক্যাচ আবার কী জিনিস।'

'সে পরে বোঝানো যাবেখন। কিন্তু দেখ বোরদে কী সুন্দর পুঁল করল লেগে।'

'আচ্ছা,' গলা নামাল মীরা: 'বোকা বোলো না কিন্তু, আচ্ছা, পুস আর পুল-এ তফাৎ কী?'

'তোমাকে যদি পুস করি, গ্যালারি থেকে তোমাকে নিচে ফেলে দিতে পারি মাত্র,' রজত উদ্ধতস্বরে বললে, 'কিন্তু যদি পুল করি, তা হলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি বাদুড়বাগান থেকে মোহন-বাগান পর্যন্ত।'

হতভম্বের মত মুখ করল মীরা: 'তার মানে কী হল?'

'মানে হবে। তাব আগে তুমি একবার মোহনবাগান হয়ে যাও।'

'সে আবার কী কথা!'

'কেন, সানাই শুনছ না? সানাই শুনলেই প্রাণটা বিয়ে-বিয়ে করে। মনে হয় আয়ী মিলনকী বেলা। তারপর সকালবেলা কী হল? খেলোয়াড়দেব গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল না?'

'উঃ, আমার তখন যা বুক কাঁপছিল।'

'কেন?'

'যদি কেউ গলার মালা তুলে নিয়ে ওদের কারু গলায় দুলিয়ে দিত?'

'শকুন্তলা হয়ে যেত।'

'কী সর্বনাশ! তাই আমাদের কলেজে কোনো মাননীয়

অতিথিকে মালা দিয়ে আমরা বরণ করি না। মালা ভীষণ রিস্‌কি। গলায় ফিরিয়ে দিলেই গোলমাল।'

'তা হলে কী দাও?'

' 'বোকে' দিই, 'আর তা হাতে।'

' 'বোকে' 'কেউ ফিরিয়ে দেয় না বুঝি?'

'না।'

'আমি হলে দিতাম,' রজত গম্ভীরমুখে বললে, 'আর বলতাম, বোকে, তোমার বোকে ফিরিয়ে নাও।'

'প্রথম বোকে-টার মানে কী হল?' ভ্রূকুটি করল মীরা।

'ওটা বোকা-শব্দের সম্বোধন। নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ। গলায়-গলায় এড়াতে গিয়ে এদিকে হাতে-হাতে হয়ে গেল।'

'হাতে-হাতে কিছুই হয় না।'

'শুধু হাতাহাতি হয়।' রজত হাতের একটা নিষ্ফল মুদ্রা করল: 'তাই তো বলছি তুমি শুধু মোহনবাগান হয়ে যাও। সানাই বাজিয়ে গলায় মালা দেওয়াই তো মোহনবাগান হওয়া।'

'কিন্তু বাদুড়বাগান থেকে টেনে নিয়ে যাবে বলছ কী।' টলটলে কৌতুলে তাকাল মীরা।

'কেবল ব্যাট আর ব্যাট—ব্যাট মানে বাদুড় তো, আর দেখেছ তো গাছে কেমন বাদুড় পড়ে! যে ব্যাট ধরছে সেই কেমন রান করছে এন্তার। আজ বোদরে-দুরানি করছে, কাল সোবার্স-কাউড্রে করবে। লরি থাকলে সেও বোধহয় এক লরি রান তুলে নিত। বলা যায় না, শেষে হয়তো দেখবে, দেশাই-চন্দ্রশেখরও রানে রানে হায়রান হয়ে উঠেছে। এত যেখানে ব্যাট, সবাই যেখানে ব্যাট, সেটা বাদুড়বাগান নয় তো কী!'

খিল-খিল হেসে উঠল মীরা। বললে, 'তা হলে শিগগির চলো, বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলি।'

খেলা দেখার যাবতীয় সরঞ্জাম কুড়িয়ে নিল রজত। বললে,

'চলো। এখন ভয় হচ্ছে তোমার বাবা না কলাবাগান হয়ে বসেন।'

'না, না, তিনি আশীর্বাদ করবেন।'

'আশীর্বাদ করবেন?'

'হ্যাঁ করবেন। কেননা তিনি দেখবেন আমি এক মোহনকেই বাগিয়ে এনেছি।'

মানুষ জপায় বিধি মাপায়

সিঁড়ি তুমি কার ? . যে যায় তার।

ব্যাট তুমি কার ? যে রান করে তার।

কিন্তু ব্যাট ধরলেই রান হয় না। কলম ধরলেই আসে না কবিতা।

মাঠ আছে লাঙল আছে গরু আছে—সর্বোপরি বাহুতে বল আছে। চুটিয়ে চাষ করলাম। শুধু চাষ করলেই কি হবে ? জল কই। জল আমাকে কে দেয় ? কর্ষণেই তো বর্ষণ নেই। আব বর্ষণ না হলে ফসল নিস্ফল।

বল বাহুর কিন্তু জল ইন্দ্রের।

দু হাতে কাজ করতে পারি কিন্তু ফল হাতের বাইরে। আমার জমিখানা থুয়ে দু পাশেব জমিতে বৃষ্টি হল! আর আমার যদি বা হল, দু-এক ফোঁটা। আর যদি বেশি হল বীজ পচে গেল।

বেশি খেলে মধুও বিষ।

কত সাধ কত স্বপ্ন কত তোড়জোড় কত সাজগোজ—সব এক নিমেষে ধূলিসাৎ। আকাশভবা রোদ, মাঠভরা সবুজ, চারদিকের গ্যালারিভবা অগুনতি দর্শক—সব মিলে যেন একটা স্তব্ধতার সুরঝঙ্কার। মাঠেব এক প্রান্তে চিত্রগুপ্তের খাতাটা বিশাল একটা স্কোরবোর্ডের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অন্তরালে আছে না জানি কত গুপ্ত চিত্র। শূন্য না নিরানব্বুই ? না কি শত শ্লোক ?

কত স্বপ্ন—চারে চারে সোচ্চার হবে, মারে-মারে ধুন্ধুমার। ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার সে কী রাজকীয় ভঙ্গি, ব্যাট ঘোরাবার সে কী রমণীয় দীপ্তি আর একেকটা মার যেন মূর্ছনা। আর ছয় যা মারল তার বল আর মাটিতে পড়ল না, তারা হয়ে ফুটে রইল আকাশে।

কিন্তু ম্যান প্রপোজেস গড ডিস্‌পোজেস। মানুষ জপায় বিধি মাপায়। এক বলেই আউট। ডাক্, ব্রব—বাঙলার যাকে বলে লাড্ডু, রসগোল্লা। কখনও বা দুই ইনিংসেই এক গতি। যাকে বলে একজোড়া চশমা। বাঙলায় বললে, এক গালে চুন, এক গালে কালি।

পা চলে না প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে এসেছিল, কিন্তু এখন ধরাও নেই সরাও নেই, দাঁড়িয়ে থেকে তলিয়ে যাওয়া। ঘরে ঢুকতে দরজা খুঁজে না পাওয়া। বিরলে গিয়ে কাঁদতে বসা।

সমস্ত বৃথা, বৃথা অস্ত্র-শস্ত্র। 'বেশভুষা কর মিছে, শ্যাম তোমার মথুরা গেছে।' তোমার ভাগ্যশশী অন্য আকাশে গিয়ে উঠেছে। তোমার সমস্ত হিসেব বানচাল, সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র অকর্মণ্য।

জীবনের মতই ক্রিকেট এমনি প্রতারক বা, বলতে পারি, এমনি সুরসিক।

তাই ব্র্যাডম্যান শূন্য, হাটন শূন্য, হার্ভে শূন্য, মে শূন্য—কে শূন্য নয়? শূন্য ছাড়া পুণ্য নেই। সব খেলাতেই পূর্ণ হব জীবনের সঙ্গে এমন সঙ্কীর্ণ সর্ত করে আসিনি বলেই প্রাণলীলা এত মনোহর। সবাই যদি সেঞ্চুরি করবে তবে সে খেলা কে খেলে কে দেখে? যার সেঞ্চুরি করবার কথা সে জিরো করবে, যে এক বলের খদ্দের সে শতমারী হবে, তবেই তো খেলা। তবেই তো জীবনাট্য।

শুধু ব্র্যাডম্যানকে হলেই চলে না, লারউডকেও দরকার। আর ব্র্যাডম্যানের জন্যেই লারউড। যেমন ভানু তেমনি হনু। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

বডিলাইন বল না করলে যে ব্র্যাডম্যান আউট হয় না। অস্ট্রেলিয়ার এক সেসনজজ লিখলে যে এমনতর বল করা ফৌজদারি আইনের আওতায় আসে, হ্যাঁ, বিদ্বেষ না থাকলেও আসে। লারউড বললে, সেই সঙ্গে সমস্ত ইংলণ্ড বললে, তাহলে তিন-চারশো রান করাও ফৌজদারি।

উনিশ শো তিরিশ সালের ব্র্যাডম্যান। একদিনে তিনশো নয় রান। ইংলণ্ডভ্রমণে এসেই প্রথম খেলাতে দু'শো। টেস্টে ৩৩৪, ২৫৪, ২৩২ আর ১৩১, আর কাউন্টি ম্যাচে ২৩৬, ২০৫, ১৯১, ১৮৫ আর ১১৭—এ তো মানুষ নয় দৈত্য। জগজ্জনের দুর্বার আকর্ষণ।

যারা ক্রিকেটের ক্রি জানে না তারাও মাঠে এসে ভিড় করল। এ তো দুই দেশের খেলা নয়, এ শুধু একজনের উৎসব। নাটকে শুধু একজনই রাজা। এই গ্রহে শুধু একজনই অধিবাসী। আর তার নাম ব্র্যাডম্যান।

ইংলণ্ডের কাছে ব্যাডম্যান।

ব্র্যাডম্যান নামছে, সমস্ত মাঠ এক আনন্দছন্দে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ব্র্যাডম্যান আউট হয়ে গেল, ফাঁকা হতে লাগল গ্যালারি। আর কী দেখে। রাবণ বধ হয়ে যাবার পর আর রামায়ণ থাকে না। সীতার বনবাস দেখবার জন্যে কে আর অপেক্ষা করে।

বডিলাইন বা লেগথিওরি বুঝতে হলে ব্র্যাডম্যানের দুর্ধর্ষতাকে বোঝা দরকার। ব্র্যাডম্যানকে দাবাবার জন্যেই বডিলাইনের উদ্ভাবন। বডিলাইনটা আকস্মিক নয়, অনেক গবেষণা ও ষড়যন্ত্রের যোগফল। অনেক অনিদ্রা অনেক দুশ্চিন্তা অনেক ব্যথাহত অপমানের প্রতিচ্ছায়া।

ইংলণ্ডের গ্রেস এক বুক দাড়ি নিয়ে ব্যাট করছে, বল করছে অস্ট্রেলিয়ার আর্নি জোনস। একটা বেমকা বল লাফ দিয়ে উঠে গ্রেসের দাড়ির মধ্য দিয়ে উড়ে পালাল। 'দুঃখিত।' জোনস এসে গ্রেসের কাছে ক্ষমা চাইল : 'ইচ্ছে করে নয়, হাত ফসকে ও তোমার দাড়ি ছুঁয়েছে।'

লারউড ক্ষমা চাইল না। তার পক্ষে ক্ষমা চাওয়াটা ভণ্ডামি হত। সে তো ভেবেচিন্তে আঁক কষেই বডিলাইন বার করেছে। ব্র্যাডম্যানকে বলো ভদ্র রকম স্কোর করতে, আমিও তা হলে সুশীল বালক হব। কিন্তু উনি যদি দুরন্ত হন, আমিও দুর্দান্ত।

সুতরাং ওল্ডফিল্ডের মাথা ভাঙল, উডফুলের পাঁজর ভাঙল আর পনস্‌ফোর্ড এগারো দফা থেঁতলানি খেলে।

আর ব্র্যাডম্যান? বোধহয় আঁচ করতে পারেনি গোকুলে কোন শত্রু দুধে-কলায় বেড়ে এসেছে। তার বলের লক্ষ্য কাঠের স্ট্যাম্প নয়, মানুষের মাথা।

ক্রিকেটে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা কী হবে তা তো চাণক্যও বলে দিয়েছে।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেত॥

বুদ্ধিমান এক পায়ে চলে অন্য পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরস্থান ভালো করে না দেখে পূর্বস্থান ত্যাগ করে না।

আর এই নিখুঁত ভঙ্গিতে ব্র্যাডম্যান তো শিক্ষিততম।

কিন্তু কী হল? রান করবে না প্রাণ বাঁচাবে! য়্যালেনের হাতে কোমল একটি ক্যাচ তুলে ব্র্যাডম্যান আউট হয়ে গেল।

কে ভেবেছিল ব্র্যাডম্যানের হাতে যে ব্যাট একদিন বীণা ছিল তা শেষে একটা বেড়াবার ছড়িরও অধম হয়ে যাবে।

মানুষ জপায় বিধি মাপায়।

বলতে গেলে ব্র্যাডম্যানই ক্রিকেটের অবসান। কেননা তার জন্যেই বডিলাইনের সৃষ্টি—বাম্পার বাউন্সার বিমার-এর বজ্রপাত।

লারউড আর ভোস-এর পাল্টা হয়ে অস্ট্রেলিয়ার এল লিণ্ডওয়াল আর মিলার আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মানবদানব হল্‌ আর ওয়াটসন, গ্রিফিথ আর গিলক্রিস্ট। শুরু হল মাথা ফাটাফাটির পালা। শেষ পর্যন্ত আমাদের কণ্ট্রাক্টরের আর এমন কি মানব-দানব হেনড্রিকসের।

কে ভেবেছিল যানবাহনের দুর্ঘটনার পরেই ক্রিকেটের খুনজখম। আর লারউডের আমল থেকেই এখন বডিলাইনের আধিপত্য। এখন আর ব্যাটিং করতে শেখা নয়, উড়ন্ত চাকতির সামনে ডাকিং করতে

শেখা। কে কতবার মাথা নুইয়ে বলকে উপর দিয়ে চলে যেতে দিয়েছে তারও স্ট্যাটিসটিকস হচ্ছে আজকাল। কে কত মিনিট খুইয়েছে এর দরুন।

কিন্তু ব্র্যাডম্যানের শেষ টেস্টে কী হল? তখন তো বাম্পার নয়, সে শূন্য করল কী বলে?

ভাবুন অবস্থাটা। টেস্টে ব্র্যাডম্যানের সাকুল্য রান হয়েছে ছ হাজার নয়শো ছিয়ানব্বুই। আর মাত্র চার রান করলেই তার টেস্ট এভারেজ ঠিক একশোতে এসে দাঁড়ায়, দেখতে কেমন সুন্দর হয়। আর কব্জির সামান্য একটু ঘুরন্ত ঘুর্ণিতেই তো ব্র্যাডম্যানের চার।

কিন্তু মানুষ জপায় বিধি মাপায়। হোলিজ-এর গুগলিতে ব্র্যাডম্যান হাঁস খেয়ে বসল। 'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নাগরী, শূন ভেল যমুনা শূন ভেল গাগরী।' ব্র্যাডম্যানের এভারেজ গিয়ে দাঁড়াল ৯৯.৯৬এ।

আর শেষ টেস্টে হবসই বা কী কবল। হবস যখন নামছে তখন সে কী হট্টগোল। এক আকাশ প্রতীক্ষার নিচে এক সমুদ্র আনন্দ।

কিন্তু হল কী? ঠিক শূন্য নয়, নয় করে আউট হয়ে গেল হবস। যেমনটি ভেবেছিলে তেমনটি হল না, আর এমনটিই হল যা বিস্মরণেও ভাবোনি।

প্যাভিলিয়নে ফিরে যাবার বেলায় হবসের হাত থেকে গ্লাভস খসে পড়ে গেল আর এমনভাবে সে তাদের কুড়িয়ে নিল যেন কতদিনের দুর্বলতার রুগী।

আর এই সেদিনও প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হাণ্টের গেট ভুল হয়ে গেল। অস্টেলিয়াব বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাণ্ট আর কানহাই দুজনেই প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও লক্ষ্যের কাছাকাছি এসেছে দুজনে। পর পর দু ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার

বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি নতুন ইতিহাস। নিরানব্বুইয়ের মাথায় একটা ঠোকর দিয়েই—রান নেই—তবু ছুটল কানহাই। হাণ্ট যদি না ছোটে কানহাই রান আউট হয়ে যায়। আর ছুটলে সে গেট আউট। আমি তরুণতর, জীবনে আমি আরো অনেক শিকার করতে পারব। তুমি কানাই, তোমার বাঁশিই অটুট থাক, বলে হাণ্ট বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। দরজা ভুল করে চলে গেল দর্শকদের এলাকায়। সকলের মধ্যে একলা হবার জন্যে।

কে জানত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিরানব্বুই করে পনেরো মিনিট লেগে থেকেও পঙ্কজ রায় আর একটিমাত্র রান যোগ করতে পারবে না। কত এক রান সে করেছে, হায় নিরানব্বুয়ের পরের সেই এক রানটি সে করতে পারল না।

আর ১৯৫২ সালে লিডস টেস্টে ভারতবর্ষের সেই মহাভারত রচনা। চার উইকেটে শূন্য। বোর্ডের চেহারাটা কল্পনা করুন। চার নম্বর ব্যাটসম্যান শূন্য, তিন নম্বর ব্যাটসম্যান শূন্য। লাস্ট প্লেয়ার শূন্য, লাস্ট উইকেট শূন্য। টোট্যাল শূন্য। শূন্যের শূন্যপুরাণ!

কে ভেবেছিল?

আর কে বা ভেবেছিল ১৯৪৬এ সারের বিরুদ্ধে সারভাতে আর ব্যানার্জির কীর্তি। শেষ উইকেটে সুঁটে যখন নামল তখন গ্রাউণ্ডসম্যান মাঠে নেমে সারের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলে, পিচে সে কেমনতরো রোলার ব্যবহার করবে। নাইনথ উইকেট পড়বার পর ওরকম জিজ্ঞাসাই রীতি। কে জানে কী বলেছিল সারের ক্যাপ্টেন। না আউট হয় সুঁটে, না আউট হয় সারভাতে। পরদিন চা পর্যন্ত তারা বাঁচা। দুজনে দুটো সেঞ্চুরি আর দুজনে মিলে শেষ উইকেটে দুশো উনপঞ্চাশ!

কে ভেবেছিল

কে ভেবেছিল স্টাম্পের ওপর হাটনের টুপি পড়ে বেল বিচ্যুত হবে না আর সোলোমনের টুপি পড়ে বেল ভূমিসাৎ হবে। হাটন

নট-আউট আর সোলোমন অস্তমিত। টুপিটা খসে পড়া তো দুর্ঘটনা, তার জন্যে শাস্তি? যত খুশি টুপি খসুক কিন্তু বেল খসে কেন?

আর দুর্ঘটনাই তো সমস্ত।

ট্রাউজার্সের হিপ-পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে স্টান ডসন ব্যাট করছিল। পেস্-বউলার ড্যানি লং-এর একটা জ্বলন্ত বল ছুটে এসে সেই দেশলাইয়ের বাক্সের উপর পড়ল। আগুন ধরে গেল নিমেষে, ঘা খেয়ে সবগুলো কাঠি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। হাতের থাবড়ায় আগুন নেভাতে ডসন ক্রিজের বাইরে এসে দাঁড়াল। উইকেটকিপার তাকে স্টাম্প আউট করে দিল।

কে ভেবেছিল এমন একটা আগ্নেয় আউটও হয় মানুষে।

আম্পায়ার অবশ্য পরে তাকে 'রিকল' করেছিল, আর একবার আগুন নিভে গেলে কি আর জ্বালানো যায়! না প্রেমে না ক্রিকেটে। একটা চার মেরেই আবার আউট হয়ে গেল ডসন।

আর হাটন কী করল? টেস্টে প্রথম ইনিংসে শূন্য, দ্বিতীয় ইনিংসে এক।

কে ভেবেছিল 'অবস্ট্রাকশনের' জন্যে তাকে আম্পায়ার আউট দেবে? ব্যাটে লেগে বলটা উঁচু হয়েছে, স্ট্যাম্পের উপর না পড়ে— তাই বুঝি হাটন ব্যাটটা একবার শূন্যে নেড়েছিল। বল ব্যাট স্পর্শ করেনি, স্ট্যাম্পেও পড়েনি। তবু হাটন আউট। কেননা ঐ ব্যাট নাড়ায় সে উইকেটকিপারকে ক্যাচ লুফতে বাধা দিয়েছে।

আর এণ্ডিন কিনা হ্যাণ্ডবলের জন্যে আউট হল। হ্যাঁ, ক্রিকেটে হ্যাণ্ডবল। আর ক্রিকেটের ইতিহাসে ঐ বুঝি একবার।

আর কে এ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে ৭৩৭-এ অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজে 'টাই' হবে। এ শুধু মানুষের নয় মহাকালের নির্দেশেই হতে পারে।

বেয়ারাকে বড়সাহেব আর বড়সাহেবকে বেয়ারা করা একমাত্র

ক্রিকেটেই সম্ভব। সকল পথে তাড়াতাড়ি করিয়ে না খেয়াঘাটে গড়াগড়ি খাওয়ায়।

তাই 'অসারে খলু সংসারে' যতদিন পারো ব্যাট চালিয়ে যাও। কখন আম্পায়ার আঙুল তুলে দেয় ঠিক নেই।

যাদের আশা প্রচণ্ড তাদের নিরাশাও প্রত্যাসন্ন। আশা রাখবে না, ভয়ও করবে না, শুধু খেলে যাবে। আউট হয়ে গেলে আউট হয়ে যাবে। জীবনে নট-আউট হয়ে থাকাই তো কলঙ্ককর।

অকর্ণ না অনর্জুন

সাবধানের মার নেই।

আবার মারেরও সাবধান নেই।

চলতে-বলতে ওস্তাদ, হিসাবে-কিতাবে মজবুত, কখন কি করে কে জানে, মুহূর্তের ভগ্নাংশে ঘটে গেল বিভ্রান্তি, ঘটে গেল অন্যমনস্কতা। চলা বাস থামছে, না, থামা বাস চলতে শুরু করেছে, এটুকু যোগ-বিয়োগের ভুলে মুখ থুবড়ে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। ফুটপাতে চলতে চলতে পায়ের নিচে এসে গেল কলার খোসা। কোত্থেকে একটা ষাঁড় এল তাড়া করে। বাম্পার বল দেখে 'ডাক' করতে গিয়ে দেখা গেল বল লাফাল না, 'ডাক' করার দরুনই মাথা ফেটে দু-খণ্ড।

তবু এসব ক্ষেত্রে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, অসতর্কতার ওজুহাতটা টানলেও টানা যায়। কিন্তু এমন কতগুলো কাণ্ড ঘটে, ঘটতে পারে, যেখানে ভুল-অভুলের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, বিনা মেঘেই বাজ পড়ে। কোথায় রাম রাজা হবে, না, বনবাসে চলল। ট্রেনে করে যাচ্ছে, খোলা জানলা দিয়ে উড়ন্ত একটা ঢিল এসে ঠিক চোখে পড়ল। একটা ওভারবাউণ্ডারির বল ঠিক লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লুফে নিলে। মাথার থেকে টুপি পড়ে 'বেল' খসিয়ে দিয়ে আউট করে ছাড়লে।

সমস্ত কপাল।

কপাল যদি মন্দ হয়, দুর্বাক্ষেতে বাঘের ভয়। কপালে নেই কো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী।

মানুষ শত বৈজ্ঞানিক হয়েও এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পারবে না কোনোদিন। যাত্রা করবার আগে দুর্গা-দুর্গা বলবে। পরীক্ষায় বেরুবার আগে দোরগোড়ায় পূর্ণ ঘট

দেখবে, পকেটে মা-কালীর ফুল নেবে, কপালে দইয়ের ফোঁটা। হাতে তাগা বা ডোর বাঁধবে। আকাশে শঙ্খচিল কোথায়, রাস্তায় যদি একটা বৎসপ্রযুক্তা ধেনু দেখে তাহলেও মনটা খাঁটি থাকে বোধ হয়।

মানুষ এমনি অনুপায়। সে দেখছে বারে-বারেই দেখছে, ফল তার কর্মের মধ্যেই নেই। ওয়েবস্টার ডিক্সনারি মুখস্থ করে গেলেও পরীক্ষায় ফার্স্ট হব না যদি না অনুকূল প্রশ্ন আসে, যদি না অনুকূল পরীক্ষকের কাছে খাতা পড়ে, যদি না অনুকূল মেজাজে সে খাতা দেখে। অনুকূল প্রশ্ন বা পরীক্ষক বা পরীক্ষকের মেজাজ কোনোটাই আমার কর্মের মধ্যে নেই। তাই বাধ্য হয়েই ভাগ্যকে ভজনা করি। যত তুক-তাক ফুঁক-ফাঁক সব সেই ভজনের অঙ্গ।

কোনো নিশ্চয়তা নেই বড়ো-বড়ো ডাক্তার জড়ো করলেই রুগী ভালো হবে। বড়ো-বড়ো উকিল লাগালেই মামলা জিতব! বা বড়ো-বড়ো য়্যাক্টর আনলেই জমবে নাটক। বা বাছা-বাছা শব্দ সাজিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে কবিতার লাবণ্য।

অথচ, এমন আবার মজা, চুপ করে বসে থাকলেও কিছু হবার নয়। না পড়লে ফার্স্ট হওয়া যাবে না। না ছুটলে ধরা যাবে না ট্রেন। ব্যাট না নাড়লে করা যাবে না সেঞ্চুরি।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক ডাক্তারির সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক চরণামৃত মেশাই। উকিলকে বৈজ্ঞানিক আর্গুমেণ্ট করতে বলে মামলার ফলের জন্যে ডুমুর গাছে গিয়ে সুতো বাঁধি, নবগ্রহের কবচ আঁটি। ব্যাটকে বলি, তুমি বৈজ্ঞানিক মার দেখাবে জানি তবু সেই ছোট টুপি, ছেঁড়া শার্ট আর ময়লা বুটটাই পরে নিই।

হ্যাঁ, কুসংস্কার। হলই বা না কুসংস্কার। তার হাত থেকে কোনো মানুষের ত্রাণ নেই। একভাবে না একভাবে লেগে থাকে, জেগে থাকে মনের কানাচে। নিজের দু বাহুর শক্তিতে কাজ উদ্ধার করব এ অহঙ্কারটাও কুসংস্কার। যেহেতু এটাও অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কী।

অন্ধবিশ্বাসে আর কিছু না হোক বুকের নিঃশ্বাসটা সহজ হয়, স্নায়ুমণ্ডলী ঠাণ্ডা থকে। আর এই তাপ ও চাপের যুগে সেটা কম লাভ নয়।

'কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?' আজ সর্বকার্যে অসিদ্ধি। পিত্তশূলের ব্যথার মত সেই মুখটা সমস্ত মন ঘোলাটে করে রেখেছে। আর, আহা, ভোরে উঠেই সে মুখখানি দেখলাম, দিন আজ না জানি কী সৌভাগ্য নিয়ে আসে!

এমনি একটা প্রসন্ন বিশ্বাস। একটা মানসিক অবলম্বন।

হাটনের টুপি, বেনো-র শার্ট, ম্যাকে-র বুট।

আরো কতজনের কত কী।

উনিশশো আটত্রিশের টেস্টে ওভ্যালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলছে হাটন। লিণ্ডওয়ালের একটা উড়ন-তুবড়ি বল তার টুপিতে লেগে বেরিয়ে গেল। টুপিটা পড়ল স্ট্যাম্পের উপর, কিন্তু, কি আশ্চর্য, 'বেল' খসে পড়েনি। হাটন আনন্দে টুপিটা বুকে চেপে ধরল, পরে মাথার জিনিস মাথায় রাখলে। পয়মন্ত টুপি—সৌভাগ্যের হাসিমুখ। শুধু আউট থেকে বাঁচাল নয়, তিনশো চৌষট্টি করিয়ে একেবারে তুঙ্গে তুলে দিল।

এর পর ও-টুপি কে ছাড়ে? হাটনও ছাড়ল না। বরাবর প্রতি মাঠে প্রতি ম্যাচে এ টুপি সে মাথায় করে বেড়িয়েছে। এ টুপিই তার 'চার্ম', তার 'ম্যাস্কট', তার সৌভাগ্যের সনদ, তার সাফল্যের ছাড়পত্র। এ টুপিই তাকে নাইটহুড এনে দিয়েছে।

প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলে দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি করা যাবে এমন কোনো কথা নেই, অক্লেশেই শূন্য করে বিদায় হওয়া যায়। তারই জন্যে রক্ষাকবচ। যখন খেলি না তখন এটা অযৌক্তিক, কিন্তু যখন খেলতে নামি তখন এটা স্বভাবের বস্তু।

আমরা অনেক কিছুই পাই না। পুরস্কার যেমন পাই না, তেমনি প্রাপ্য শাস্তিও তো পাই না। পুরস্কার না পেয়ে নালিশ

করি, কিন্তু প্রাপ্য শাস্তি যখন পাই না, তখন জানি না কাকে ধন্যবাদ দিই ? হাটনের মত টুপিটাকেই বুকে চেপে ধরি।

আর 'বেনো, অস্টেলিয়ার জাঁদরেল ক্যাপটেন, ছ ফুট লম্বা অলরাউণ্ডার—তার একটি শার্ট আছে। জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, সূক্ষ্ম হাতে সেলাই করা। বলে, এটি আমার পয়া শার্ট। এটি আমার গায়ে থাকলেই আমার কপাল খোলে। এটি আমি ছাড়ি না। ধোপাবাড়ি দিই না। নিজ হাতে সাবান-কাচা করে রাখি। ছিঁড়লে স্ত্রী সস্নেহ যত্নে সেলাই করে দেন।

সেদিন মাঠে তুমুল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মাঠ থেকে ড্রেসিংরুমে ফিরতে ফিরতে ভিজে গেল সকলে। তাদের মধ্যে বেনো একজন। সবাই শার্ট-প্যাণ্ট বদলালে, বেনো বললে, প্যাণ্ট বদলাব বটে কিন্তু শার্ট নয়। সে কী, শার্ট ভিজে যায় নি ? গিয়েছে। দাঁড়াও যতটা পারি হাওয়াতে শুকিয়ে নিই। যদি ইতিমধ্যে না শুকোয় ভিজে শার্ট পরেই মাঠে নামব। অন্য শার্ট পরে নামলে নির্ঘাৎ বিপদ।

খাঁটি খেলোয়াড়ের মতই বেনো ভাগ্যভক্ত। বলে, ভাগ্যকে ছোঁয়ামাত্রই আলিঙ্গন করে নিতে হয়। যদি মনে করো কৃতিত্বের কারণ তুমি নিজে, তোমার নিজের নৈপুণ্য, তাহলেই আর দেখতে হবে না, ভাগ্য তোমাকে দারুণ আঘাত হানবে। আমিরকে ফকির করে ছাড়বে।

উনিশশো একষট্টির ম্যানচেস্টার টেস্টে সেকেণ্ড ইনিংসে ২৫৫ করলে ইংলণ্ড জিতে যায়। তার পক্ষে তা করা মোটেই অসম্ভব নয়, প্রথম ইনিংসে সে ৩৬৭ করেছে। কিন্তু কী হল ? সকরুণ বেণু বাজায়ে চলে গেল পিটার মে, আর গ্রাউটের হাতে ধরা পড়ল ডেক্সটার। দু ক্ষেত্রেই বউলার বেনো।

ইংলণ্ড পারল না, অস্ট্রেলিয়াই জিতল ম্যানচেস্টারে। জেতবার পর নীল হার্ভেকে বলছে বেনো, খেলা আমাদের নয়, খেলা অদৃষ্টের।

ধরো বলটা যদি ডেক্সটারের ব্যাটটা হঠাৎ না ছুঁত, কিম্বা ধরো যদি মে-র লেগ স্ট্যাম্পের এক চুল বাইরে থাকত! তা হলে, কথা নেই, আমরা শেষ হয়ে যেতাম। সব কিছুর মূলে ভাগ্য।

মনে মনে বললে, সব কিছুর মূলে সেই ছেঁড়া শার্ট।

আর ম্যাকে-র বুট ছেঁড়া কেন? ওর কি জুতোসেলাই জোটে না? নতুন এক জোড়া কিনে নিতে ক্ষতি কী! কেন, পয়সা নেই?

যাও না দামটা দিয়ে এস তাকে। শুনে এস কী বলে।

দাম না নিক, দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিতে পারে তো বুট দুটো। যাই, তাই বলি গে।

কী, বলেছিলে? কী বলল ম্যাকে?

আর বোলো না। বললে, ঐ ছেঁড়া ঢল-ঢলে বুটই ওর পয়া। ওটা ছেড়ে অন্য বুট পরে খেললেই ও সর্বস্বান্ত।

প্যাড বাঁধবে—আগে বাঁ, পরে ডান পা। একজনের আউট হয়ে যাবার পর পরের জনকে দু মিনিটের মধ্যে ক্রিজে এসে দাঁড়াতে হয়। দু মিনিটের বেশি হয়ে গেলেই সে আউট। তাই পরের জন আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে যাতে একজনের আউট হবার পর তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে দু মিনিটের বেশি না হয়।

একবার হল কী, আগে থেকে তৈরি ছিল না, একজন আকস্মিক আউট হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পড়ি-মরি করে সাজগোজ সেরে নেমে পড়তে হবে। আশ্চর্য সেই বিভ্রান্তিকর ত্বরার মুখেও আগে বাঁ প্যাড, বাঁ গ্লাভ।

প্রত্যেকটি বলের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হবস ব্যাটের হাতল ধরে ব্যাটটাকে একটু ঘুরিয়ে নেয়। ওটা কি আপনার মুদ্রাদোষ? না, ওটা আমার মন্ত্র। ব্যাটটা একটু ঘুরিয়ে নিলেই তার সব আপদ কেটে যায়, মারমুখো বল তার কিছু মন্দ করতে পারে না।

ফিলিপ মিড কী করত? বল পাবার আগে অলক্ষ্যে একবার

টুপিটা ছুঁত, অর্থাৎ কিনা, বলকে নমস্কার করত। যাকে নমস্কার করি সে চট করে শত্রুতা করবে না সেই বিশ্বাসে ব্যাটকে বলশালী করত। নমস্কার করবার ভান করে অবশ্যি শত্রুকে একটা চড় বসিয়ে দিতে আপত্তি নেই। তুমি, বল, দুর্বল থাকো আর আমি ব্যাট, বাউণ্ডারি করি।

কপালে হাত ঠেকিয়ে দু কাজ সারা। সেলামও করা, আবার কপালটা চুলকেও নেওয়া।

ব্র্যাডম্যানও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়। সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে ১৯৬৩ সালে, ডেভিডসন দুর্দান্ত বল করছে, একের পর এক উইকেট পড়ছে ইংলণ্ডের, ড্রেসিংরুমে বসে দীপ্ত চোখে তাই দেখছে ব্র্যাডম্যান। এমন সময় মেম্বার-স্ট্যাণ্ড থেকে তার ডাক এল, জরুরি পরামর্শের জন্যে এখনি তাকে প্রয়োজন। সিট থেকে উঠছে না, নড়ছে না ব্র্যাডম্যান। আবার ডাক। ব্র্যাডম্যান আবার তা অগ্রাহ্য করছে। স্যার, আবার টেলিফোন এসেছে। ব্র্যাডম্যান বিরক্ত হয়ে বললে, বলে দাও, আমি যদি এখন এ সিট ছাড়ি, ডেভিডসনের তন্ময়তা নষ্ট হয়ে যাবে। কোথায় ড্রেসিংরুম আর কোথায় মাঠ। তা হলে কী হয়! ব্র্যাডম্যানের ঐ সিট আঁকড়ে বসে থাকার দরুনই তো সেবার ডেভিডসনের পঁচিশ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট। আর গোটা ইংলণ্ডের মোটে ১০৪ রান।

প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো শুভচিহ্ন আছে। কোনো ছবি কোনো মুদ্রা বা কোনো রুমাল। কারু কারু বা পয়া চুয়িংগাম। সেটা যতক্ষণ চিবোচ্ছ ততক্ষণ আউট হচ্ছ না। কারু কারু বা বিশেষ কোনো ভঙ্গি, দৃষ্টি বা পদক্ষেপ। শত অযৌক্তিক হোক অলৌকিকে মানুষের বিশ্বাস মজ্জাগত। ভূত না মানুক ভূতের ভয় তার রক্তের মধ্যে মেশানো।

তাই পাছে শূন্য করে, 'ডাক' খায় না, ল্যাম্বের ফ্রাই খায়। বাঁয়েতেই লক্ষ্মী বলে বাঁ হাতে টস করে। দুজনে একসঙ্গে মাঠে

নামবার সময় দুজনেই চায় বাঁয়ে থাকতে। এই নিয়ে মাঠে নাচানাচি শুরু হয় দেখে ঠিক হয়, কেউ কারু বাঁয়ে যাবে না, একজন আরেকজনের পিছনে যাবে। কত রকমের কুসংস্কার। ল্যাংগ্রিজের ছিল ব্যাট চালিয়েই আকাশের দিকে তাকানো। 'আকাশে কিছু লেখা নেই।' একবার বলে উঠেছিল এক দর্শক। ল্যাংগ্রিজ বলেছিল, 'লেখা আছে কি নেই তা আমি জানি।' আরেকজন বলেছিল, 'ওখান থেকে কিছু সাহায্য পাবে না।' ল্যাংগ্রিজ বলেছিল, 'যদি পাই ওখান থেকেই পাব।'

সকলেরই কিছু-না-কিছু কবচ-মাদুলি আছে, তোমার কী? জিজ্ঞেস করা হল ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান রেভারেণ্ড শেপার্ডকে। শেপার্ড বললে, আমার ওসব তন্ত্রমন্ত্রে দরকাব নেই, আমার একেবারে সরাসরি ঈশ্বর।

বলের মুখে বুক দুবদুর করে মানেই হরি-হরি বা ত্রাহি-ত্রাহি করে। কর্নেল নাইডু তো কালী-কালী আওড়ায়।

উনিশ শো তেষট্টির দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডস মাঠে শেষ ওভার বল দিচ্ছে হল্। চতুর্থ বলে শ্যাকলটন রান আউট হয়ে গেল। বাঁ হাত প্ল্যাস্টার করা, একাদশ খেলোয়াড় কাউড্রে নামল ডান হাতে ব্যাট নিয়ে। বলের মুখোমুখি উইকেটে দাঁড়িয়ে আছে এ্যালেন। ওভারের আর মোটে দুটি বল বাকি। ছ রান করতে পারলে ইংলণ্ড জেতে। আর এই শেষ উইকেটটা নিয়ে নিতে পারলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়।

পঞ্চম বলটা ঠেকাল এ্যালেন। রান হল না।

এবার শেষ বল। শেষ বলে ওভারবাউণ্ডারি করবে এ অসম্ভবেরও অসম্ভব। বরং সহজতম আউট হয়ে যাওয়া।

আর ওয়েসলি হলই এক বলে, শেষ বলে, সাগরকে নগর করে দিতে পারে।

গলায় ঝোলানো ক্রশকে গোপনে স্পর্শ করল হল, আকাশের

দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে প্রার্থনা করল। তারপর ছাড়ল তার দুর্দান্ত ধূমকেতু। একেবারে মিডল স্ট্যাম্প লক্ষ্য করে।

কী করল এ্যালেন ?

নির্বিচল প্রশান্ত ভঙ্গিতে সেই অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডবকে ঠেকিয়ে দিল।

সে কী ? হলের প্রার্থনা ঈশ্বর মঞ্জুর করল না ? কী করে করে ! এদিকে এ্যালেনও যে প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল যেন আউট না হয়।

ঈশ্বর এখন কার প্রার্থনা শোনে !

কাকে বাঁচায় কাকে কাঁচায় ! অকর্ণ না অনর্জুন !

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু

'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।' অকস্মাৎ বজ্রই পড়ল বটে। অতিমেঘে যেমন অনাবৃষ্টি হয় তেমনি আবার বিনামেঘেই বজ্রপাত।

বজ্র-বণিকের দল বেরিয়ে পড়েছে ক্রিকেট মাঠে। ইংরেজিতে বলে 'থাণ্ডারবোল্ট মার্চেন্ট।' বাঙলায় বজ্র-বণিক। যাই বলো এ বাণিজ্যে যেতেই হবে খেলতে হলে। নইলে যে ব্যাটসম্যান ভয় পায় না, আউট হয় না।

এ বজ্রে বাঁশি বাজে না, এ বজ্রে মাথা ফাটে।

'অষ্ট বজ্র শুনেছিস তো?' এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে।

'অ—ষ্ট? এক, দুই, তিন চার—' সংখ্যা গুনতে সুরু করল আরেক বন্ধু। আট পর্যন্ত গুনে কষ্টে থেমে পড়ল।

'কী রে, আটের বেশি গুনতে পারিস না?'

'আট—আট কম হল?'

'আমার তো মনে হয়, আট নয় দশ এগারো—এগারো নম্বর পর্যন্ত আছে—হ্যাঁ, না, বারো পর্যন্ত—'

'রক্ষে কর, এগারোর বেশি জেনে আমার কাজ নেই।' দ্বিতীয় বন্ধু বললে।

'কাজ নেই মানে? এগারোর বেশি যদি থাকে?'

'থাক গে। এগারো পর্যন্ত শিখলেই আমার কাজ চলে যাবে।'

'শিখলে মানে? তুই কী বলছিস?'

'বলছি এক থেকে এগারো পর্যন্ত গুনতে পেলেই আমার যথেষ্ট এর বেশি গুনতে শেখার আমার দরকার হবে না।'

প্রথম বন্ধু হাঁ করে রইল : 'তুই হলি কী ?'

'এখনো হইনি। হব।'

'কী হবি ?'

'ফুটবল ম্যাচে রেফারি হব।' দ্বিতীয় বন্ধু প্রাঞ্জল হল এতক্ষণে : 'বল, কোনো ম্যাচে এগারোটার বেশি গোল হবে ? তিন চার—সাত আট—দশ গুনতেই প্রাণ কণ্ঠাগত। তার পর যদি গোল শোধ হতে স্থরু করে তার হিসেব রাখতে প্রাণ প্রায় ঠোঁটের কাছে। তার পর যদি গোলে গোলে তালগোল পাকিয়ে যায় তা হলে প্রাণ তো খাঁচাছাড়া।'

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

'তা হলেই আপনারা বলুন,' দ্বিতীয় বন্ধু পার্শ্ববর্তীদের উদ্দেশ করে বললে, 'এক থেকে এগারো গুনতে পারা কি কম কথা ? আর যে ফুটবল খেলায় রেফারি হবে তার আর বেশি অঙ্কের প্রয়োজন কী ? বল্, তোর ক্রিকেটের কথাই বল্। অষ্ট বজ্র কী কী ?'

বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকের শক্তি, আর কালীর খড়্গ।

ক্রিকেটে অবশ্যি বজ্র একটাই—তার নাম 'বল'। বন্দুকের চেয়ে সাংঘাতিক—নাম কন্দুক। বর্তুলাকার অগ্নিপিণ্ড। বেগ-ঘূর্ণিত রক্তচক্ষু। হয় সরো নয় মরো।

> 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন—
> দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জন।
> ঘনঘন দামিনীভুজঙ্গক্ষত যামিনী
> অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু-বরিষণ ॥'

এখানে বজ্র এক, বণিক নানা।

প্রথমেই লারউড আর ভোস। পরে লিণ্ডওয়াল আর মিলার। ওদিকে হল আর ওয়াটসন। আবার ঘুরে এসে ট্রুম্যান আর স্ট্যাথাম।

আটেই পাঠ শেষ নয়। ক্যারাবিয়ানদের আরো দুজন এসে জুটল—গিলক্রিস্ট, কালো বিদ্যুৎ, আর গ্রিফিথ, কালাপাহাড়। আবার অস্ট্রেলিয়ায় মেকিফ আর ডেভিডসন। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের টাইসন দি টাইফুন।

ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনি। আবার প্রতিনিনাদ। তারপরে আবার সিংহগর্জন।

কিন্তু ভারতে কী?

ভারতে মধুপঝঙ্কার। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।' বলতে কইতে ধরে-বেঁধে আনতে সে ঐ এক রমাকান্ত দেশাই। ছোট-খাটো হালকা মানুষ, কত আর সে জোরদার হতে পারে? এবং কতক্ষণ ধরে?

কিন্তু ভারতে একদিন একজন ছিল। সে মহম্মদ নিসার। বিপুলায়তন প্রচুরশক্তিধর পাঞ্জাবী মুসলমান। ১৯১০ সালে জন্ম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে শক্তিতে সহিষ্ণুতায় দৈত্যাকার। বলে শুধু দ্রুততাই নয়, ছিল শুদ্ধতা। আর সে শুদ্ধতা যেমন গতিতে তেমনি চরিত্রে।

অর্থাৎ, নিসারের লক্ষ্য সবসময়েই স্টাম্প, ব্যাটসম্যানের শরীর নয়। বাম্পার বা বিমার-এ তার রুচি ছিল না। বলত, আমার উদ্দেশ্য 'উইকেড' নয়, আমার উদ্দেশ্য উইকেট।

ইংলণ্ডে লর্ডস মাঠে ১৯৩২ সালে এক ওভারে সে সাটক্লিফ আর হোমসকে বোল্ড আউট করলে। সাটক্লিফকে নিলে ইন-সুইঙ্গার-এ, আর হোমসকে ইয়র্কার-এ, ঠিক অফ-স্টাম্পের উপর।

চন্দনাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়র্কার কাকে বলে জানো?

চন্দনা কী না জানে? এবং বেশি জানে। বললে, 'আহা, কী প্রশ্ন! যার বাড়ি ইয়র্কশায়ারে সেই ইয়র্কার।'

'যেমন যার বাড়ি চন্দননগরে তার নামই চন্দনা। আমি বলছি বলের কথা—বলের কি বাড়ি হয়? বরং ব্যাটের বাড়ি হতে পারে।'

'বলের কথা বলছ সেটা বললেই হত! আমি ভাবছি বউলারের কথা—'

'কী বুদ্ধি! বউলার তো নিসার। তার বাড়ি ইয়র্কশায়ারে?'

'আই এ্যাম সরি।' সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলা-মতে জিভ কাটল চন্দনা।

বললাম, 'ইয়র্কার হচ্ছে সেই জাতীয় ফাস্ট বল যেটা পিচ পড়ে স্টাম্পের দিকে ঠিক ব্যাটসম্যানের গার্ড বা ব্লক-হোলের পিছনে, যাতে ব্যাটের ডগা বলের উপর দিয়ে চলে যায়। এ বল খেলাও শক্ত দেয়াও শক্ত।'

চন্দনা খিল খিল করে হেসে উঠল: 'বোঝানও শক্ত।'

'বেশ, তাই। যার যেমন শক্তি, সে তেমনিই বুঝবে।'

'বেশ তাই—ও কথাটা বেশ বলেছিলে। তার পরের কথাটা বললে কেন? ওটা তো আধুনিক কবিদের কথা। কী বলছে নিজেই জানে না, শেষে বলছে, পাঠক অপারগ।'

হ্যাঁ, তাই. তোমার আর পারে গিয়ে কাজ নেই। এটুকু জানলেই হবে নিসার একই ওভারে ইংলণ্ডের দু দুটো জাঁদরেলকে লোপাট করে দিলে। ইংরেজ সমালোচকরা কী বললে জানো? বললে, প্রথম তিন ওভারে নিসার লারউডের চেয়েও দ্রুততর। এটা নিদারুণ প্রশংসা।

লারউড! অস্ট্রেলিয়ায় যাকে বলা হয়েছিল হ্যাংম্যান— ফাঁসুড়ে। খুনে—চলন্ত খুনে, জ্বলন্ত খুনে। বলা হয়েছিল আহ্লাদে জল্লাদ। 'হুডু' বা ভুতুড়ে লারউড। কান বন্ধ করো। এ সবের চেয়েও কঠিনতর গালাগাল।

তা, অস্ট্রেলিয়ান জনতার দোষ কী! পনসফোর্ডের হাত ভেঙেছিল আগেই, এবার ১৯৩৩-এ এডিলেডের মাঠে ওল্ডফিল্ডের মাথা ভেঙে দিল। আর ক্যাপটেন, উডফুল? তার বুকে, হৃৎ-পিণ্ডের ঠিক উপরে প্রচণ্ড আঘাত। যদিও পরে আবার সে নামল, আরেকটা বাম্পার তার হাতের ব্যাটই উড়িয়ে নিলে।

খেল, কে খেলবে। কার সাহস আছে হাঁকড়াবে। নিজের গা-মাথা বাঁচাবে, না, রান করবে। স্কোর-বোর্ড নয়, ও একটা অন্ধকারের বিভীষিকা।

এ কি প্রেম না যুদ্ধ?

এ খেলা।

খেলা তো, আইন মেনে চলতে হবে। শুধু প্রেমে আর যুদ্ধেই কোনো আইন নেই।

বেশ তো, খেলারই আইন দেখাও। কোথাও আছে যে বাম্পার-বিমার চলবে না? 'ফাস্ট' বলকে 'ফাস্টার' করে দিলে তা 'আনফেয়ার' হবে এমন কথা বাইবেলে লেখে না। ফুল-টস চলবে, গা-সই চলবে না, এ কাপুরুষের কান্না।

অস্ট্রেলিয়ানরা বললে, এ দস্যুতা, অসাধুতা। ইংলণ্ড বললে, এ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। অস্ট্রেলিয়া বললে, বডি-লাইন; ইংলণ্ড বললে, লেগ-থিওরি।

বাঙলার বিপ্লববাদীদের ইংরেজ বলেছে, টেররিস্ট; আমরা বলি, রেভলিউশানারি। ওরা বলে, খুনী; আমরা বলি, শহিদ।

নিজের ছেলে নন্দদুলাল, পরের ছেলে নাড়ুগোপাল।

সব কিছুর মূলে ঐ ব্র্যাডম্যান। যদি ব্র্যাডম্যান না হত তা হলে বডি-লাইনের সৃষ্টি হত না। আর শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমাদের কণ্ট্রাক্টরেরও মাথা ফাটত না।

যে বডি-লাইনের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া একদিন ভীষণ তড়পেছিল সেই বডি-লাইনই তারা আমদানি করল প্রায় কুড়ি বছর পর ১৯৫১-৫২তে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে, লিণ্ডওয়াল আর মিলারের মাধ্যমে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তো থ। পাঁচটে টেস্টের মধ্যে চারটেতেই হেরে গেল।

হারবে না তো কী! এমন বর্বর বলের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে

পারে? অস্ট্রেলিয়া যে সমস্ত গাল দিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাই তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারল। এ কি যুদ্ধ, না, ক্রিকেট?

অস্ট্রেলিয়া তার আগের নালিশ গিলে ফেলে বললে, শর্ট পিচের ফাস্ট বল লাফিয়ে উঠবে তার কী করা যাবে! হুক করো। মানে লেগের দিকে টেনে মারো, বাউণ্ডারি পার করে দাও। তুমি হুক করতে জানো না, সেটা তোমার দোষ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বলল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। তারা খাড়া করল হল্ আর ওয়াটসন, গিলক্রিস্ট আর গ্রিফিথ।

এখন আবার অস্ট্রেলিয়া কাঁদুনি গাইছে। এ কী অসভ্যতা! এ কী দুর্দান্ত দৌরাত্ম্য!

বুঝলে না, নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুষমন।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড—ইংল্যাণ্ডের খবর কী?

তারা ব্র্যাডম্যানকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে বেশ খুশি মনে ছিল, কিন্তু ১৯৪৮এই অস্ট্রেলিয়া শোধ তুললে। পাঁচটার মধ্যে একটা ড্র আর চার চারটেই জিতল অস্ট্রেলিয়া, আর শেষটা তো এক ইনিংস আর ১৪৯ রানে। লিণ্ডওয়াল আর মিলারই বিধ্বস্ত করল।

ইংলণ্ডের হাটন আর কম্পটন দু জনেই মার খেল। হাটন বুকে, মিলারের বলে; কম্পটন মুখে, লিণ্ডওয়ালের বলে। এখন কেমন লাগছে হে যাদুধন। খুব সেদিন মেরেছিলে আমাদের। পনসফোর্ডের পাঁজরাতে তো এগারোটা কালশিরে পড়িয়েছিলে, এখন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নাও।

ইংলণ্ডের তখন লারউড নেই, সে হার-মার হজম করলে। তার প্রত্যুত্তর এল পরে ট্রুম্যান হয়ে। যার বিশেষণ হল 'আগুনে'—'ফায়ারি'।

টেস্টে ট্রুম্যানের প্রথম শিকার কে জানো? আমাদের উমরিগড়, ১৯৫২-র টেস্টে, লিডসএ। এ পর্যন্ত পঁয়ষট্টিটা টেস্ট খেলেছে ট্রুম্যান,

বারো বছরের মধ্যে তিনশোটা উইকেট নিয়েছে। এটা একটা অস্পর্শ রেকর্ড। তার জুড়ি স্ট্যাথাম-এর মোটে ২৪৫ উইকেট।

ট্রুম্যান তার একশো-নম্বর উইকেট পায় নিউজিল্যাণ্ড-এব পেট্রিকে আউট করে, ১৯৫৯ সালে, দুশো নম্বর উইকেট পায় পাকিস্তানের বার্কিকে আউট করে, তিন বছর বাদে। আর তিন শো নম্বর উইকেট পায় ১৯৬৪-র ১৫ই অগাস্ট, অস্ট্রেলিয়ার হককে আউট করে। পুরো নাম ফ্রেডরিক স্টুয়ার্ট ট্রুম্যান। সংক্ষেপে ফ্রেড। ফায়ারি ফ্রেড।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় লারউড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজই দুর্ধর্ষতম। হল আর তার দলবল যে কতজনকে ঘায়েল করেছে তার লেখাজোখা নেই। এবং প্রচণ্ডতম আঘাত ভারতবর্ষের মাথায়।

১৯৫৮-৫৯-এ মাদ্রাজে হল-এর বল রামচাঁদের মাথায় এসে পড়ল। কানপুরে পড়ল হার্ডিকারের মাথায়। হার্ডিকার তো মাঠেই অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ল।

আর বারবাডোসে গ্রিফিথেব উচ্চণ্ড মার খেয়ে কনট্রাক্টারের জীবনসংশয়। হাসপাতালে তার মাথায় দু দুটো মেজর অপারেশন হল। জীবনে কোনোক্রমে বাঁচল বটে কিন্তু ক্রিকেটে বাঁচল না।

তার পরে হলেব বলে হাত ভাঙল কাউড্রের।

আর এই সেদিন আবার গ্রিফিথ মারল ওনিলকে। আর সেবার গ্রিফিথের বল লক-এর এমন লাগল যে সে ব্যাটটা ফেলে দিল হাতের থেকে, আর, পড়বি তো পড়, পড়ল গিয়ে উইকেটের উপর। কেউ কেউ রিটায়ার্ড হ.র্ট হয়, লক হিট-উইকেট।

এ কি ক্রিকেট, না ছেলেরা রাস্তায় যে 'পিটটু' খেলে তারই উচ্চতম সংস্করণ ?

এ কি দোলের রঙ খেলা, না কি মাতালের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ?

বাম্পারে বিমারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজই নৃশংসতম। ক্যারাবিয়ান

কথাটা ক্যানিব্যাল থেকে এসেছে। কে জানে তারই জন্যে ওদেরকে ক্যারাবিয়ান বলে কি না।

কাকে না মেরেছে ওরা। গ্রাউটকে মারল ঠিক চোয়ালের উপর, চোয়ালের হাড় ভেঙে গেল। স্মিথকে কপালে, এক্স-রে করতে গেল হাসপাতালে। আর মারে-র মাথা ফেটে চৌফাঁক।

বাম্পার বলের মধ্যে বাহাদুরিটা কী? শুধু গায়ের জোর। শুধু ব্যাঘ্রবন্যতা। কোনো কৌশল নেই, কারুকার্য নেই, চাতুরীর চারুতা নেই। ট্যাকটিকস যেটা আছে সেটা শক্ ট্যাকটিকস। এটার মধ্যে একটা অসাধুতার বা অপরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া আছে। আর যা পরিচ্ছন্ন নয় তা ক্রিকেট নয়।

এ তো শুধু ভয় পাইয়ে ভক্তি আদায় করা। তার মধ্যে ধর্ম কোথায়?

তার মানে, বলতে চাও, বউলার ভালোবাসা দিয়ে ভক্তি আদায় করবে? তার মানে, রুটিন-মাফিক নরম-গরম বল দেবে যাতে ব্যাটসম্যান পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারে? এ যে দেখি আদরের ঢলসমুদ্র। আমি হাতে বল পেয়েছি, ব্যাটসম্যানকে আউট করা আমার কথা। আমার সে বল তীর হবে না বিদ্যুৎ হবে, গুলি হবে না গোলা হবে, তা আমি বুঝব। তুমি সেটা হুক করবে না পুল করবে, ডাক করবে না মাথা পেতে দিয়ে জখম হবে, তা তুমি জানো।

আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি পরচ্ছিদ্র পদে পদে। তুমি, ব্যাটসম্যান, দক্ষ নও সমর্থ নও, যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারো না, ভীরুর মত প্রতিপক্ষের নিন্দা করো। ব্যাটকে জব্দ করে দেবার জন্যেই তো বল, আর তোমার হাতে তো গদা আছে, তুমি বলকে প্রতিহত করো, মেরে ধরে একশা করে দাও। আর মারতে গেলে মার খেতেও হয়, এই দুনিয়ার নিয়ম। তাই বলে তুমি যদি আহত হও, সে খেলারই নিয়মে। তা হলে খেলতে এস না। যে মারতে পারে না সে বন্দুক

ঘাড়ে করে কেন? মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে, শেয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে! মারতে পারে না ব্যাট হাতে, বাম্পার দেখে আলু-ভাতে!

তাই বলে তুমি ওভারের সব কটা বলই গা-সই করবে নাকি? আর তাকেই বিদ্বজ্জনে ক্রিকেট বলবে?

তার জন্যে আইন হয়েছে, যদি একাদিক্রমে বাম্পার-বিমার ছোঁড়া হয় তবে আম্পায়ার প্রতিবিধান করতে পারবে।

কিন্তু প্রতিবিধান করবার আগেই দু-চারটে খুন হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

'কী রকম প্রতিবিধান?' চন্দনা চঞ্চল হল।

'ভয়াবহতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বুঝলে আম্পায়ার বউলারকে প্রথমে সাবধান করবে।'

'যদি সাবধানে ফল না হয়?'

'ফিল্ডিং সাইডের ক্যাপ্টেনকে জানাবে।'

'তাতেও যদি ফল না হয়?'

'আবার একটা মারাত্মক বল করার সঙ্গে সঙ্গেই আম্পায়ার 'ডেড বল' ডিক্লেয়ার করবে ও তখুনি ওভার শেষ হয়ে যাবে। ক্যাপ্টেনকে বলবে বউলারকে সরিয়ে নিতে, আর ক্যাপ্টেন তক্ষুনি তাকে সরিয়ে নেবে।'

'অত দূর আর যেতে হয় না।' চন্দনা হাসল: 'ক্যাপ্টেনের ভয় আছে না? আম্পায়ারের?'

চতুর্দিকে ভয়। চতুর্দিকে অশান্তি। ভারতে গিলক্রিস্টের কাণ্ড দেখে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার তাকে সরিয়ে নিল না? সরিয়ে নিল কী, একেবারে স্বদেশেই পাঠিয়ে দিল প্যাক করে।

কাণ্ডটা কী?

বলতে গেলে নিদারুণ। ক্যাপ্টেনের অবাধ্যতা। আলেকজাণ্ডার নির্দেশ দিয়েছিল যেন বেশি বিমার না দেওয়া হয়। গিলক্রিস্ট আপত্তি করেছিল: বেশি আর কম কী, কটা বা কখন, তা বউলার বুঝবে।

ফুলটস দেব না এ বলতে পারে ক্যাপ্টেন? বিমারও তো এক রকমের ফুলটস-ই। এমনি ফুলটস স্টাম্পের উপর, বিমারের ফুলটস মানুষের উপর। ফুলটস কী করে মারতে হয় সেই টেকনিক যদি ব্যাটসম্যানের অজানা থাকে, তাহলে বউলারের কী অপরাধ!

অমৃতসরে নর্থ জোন-এর বিরুদ্ধে খেলছে গিলক্রিস্ট। স্বরনজিৎ সিং, আলেকজাণ্ডারের কেমব্রিজের বন্ধু, ব্যাট করছে সেকেণ্ড ইনিংসে। প্রথম ইনিংসে শূন্য করে আউট হয়েছিল, এ পর্বে ১৫ করেছে। গিলক্রিস্ট একটা বাম্পার ছাড়ল। 'ডাক' করে পাগড়ি বাঁচাল, তাকাল ক্রুদ্ধ চোখে। যে বাম্পার দেয় তার দিকে কে কবে তাকিয়েছে স্নিগ্ধনেত্রে।

পরের বলটা নিয়মমাফিক দিল, স্বরন সিং চার মারলে।

আবাব চার মাবে বউলারের অপমান।

এই কথা? একটা ঝলসাপোড়া বিমার ছুঁড়ল গিলক্রিস্ট। পাগড়িতে-দাড়িতে নাকাল স্বরন সিং। পরের বলে আলেকজাণ্ডাবের হাতে তীক্ষ্ণ একটা ক্যাচ দিলে, আলেকজাণ্ডার ধরতে পারল না। গিলক্রিস্ট বুঝল, বিমার-বাউন্সারে আপত্তি বলে আর স্বরন সিং বন্ধু বলে আলেকজাণ্ডার ইচ্ছে করেই ড্রপ করেছে।

এই কথা? গোঁয়ারের মত পর-পর আরো দুটো বিমার ছুঁড়ল গিলক্রিস্ট। একটাতে পাগড়ি ও আরেকটাতে দাড়ি প্রায় ওপড়ায়।

আলেকজাণ্ডার গিলক্রিস্টের কাছে এসে বললে, এই তোমার শেষ বল। তুমি প্যাভিলিয়নে ফিরে যাও।

শুধু মাঠ থেকে নয়, ভারতবর্ষ থেকেই অপসারিত হও। তুমি ক্যাপ্টেনেব নির্দেশ অমান্য কবেছ। তুমি অবাধ্য, তাই তুমি অযোগ্য। অপাঙক্তেয়।

চলে যেতে হল গিলক্রিস্টকে।

এই ক্রিকেটের ডিসিপ্লিন—নিয়মনিষ্ঠা।

তবু তো এক্ষেত্রে আম্পায়ারের হস্তক্ষেপ লাগেনি। আম্পায়ার শক্ত হতে গেলে বলা হবে অন্য কথা। তবু সেবার আম্পায়ার সিড বুলার শক্ত না হয়ে পারেনি।

ওভ্যাল মাঠে খেলা হচ্ছে, ওপন্ করেছে বোলাস আর এডরিচ, বউলার গ্রিফিথ আর হল।

ইংল্যাণ্ডের আগের জুটি ছিল হবস আর সাটক্লিফ, পরে হাটন আর ওয়াশব্রুক, সেবার এডরিচ আর বোলাস। পরে বয়কট আর বার্বার।

'নো বল।' হলের বিরুদ্ধে হুমকে উঠল বুলার।

সঙ্গে সঙ্গে বল একেবারে ওস্পার।

মারাত্মক ঘা খেল হল। একে একে দু দুটো সোয়েটার আগেই গা থেকে খুলেছে। এবার তৃতীয়টা খুলে ফেলল।

তারপর বিদ্যুদ্দীপ্ত একটা বিমার ছুঁড়লে। এডরিচের কানের পাশ দিয়ে গান গেয়ে চলে গেল।

পরেরটা আরো ক্ষিপ্ত। আরো দৈত্যাকার।

তখন সিড বুলার ঘুরে দাঁড়াল। হলকে হুঁশিয়ার করে দিল।

এ শান্ত থাকে তো ও দুর্দান্ত হয়। অন্য প্রান্তে গ্রিফিথ। এমন একখানা ছুঁড়লে, এডরিচের কনুই ভেঙে গেল।

প্রথমে বল দেওয়া হত নামা হাতে, পরে আস্তে আস্তে সেটা উপরে তোলা ঘুরোনো হাতে উঠে এল। এখন আর হাত-ঘুরোনো নাড়ু নয়, এখন প্রায় টাক তাক করে ঢিল ছোঁড়া।

যারা চাকা ছুঁড়ে মারে তাদেরই বুঝি 'চাকার' বলে। অস্ট্রেলিয়ার মেকিফ বাদ পড়েছিল একদিন। ইদানিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রিফিথ না বাদ পড়ে।

কিন্তু আমাদের, ভারতবর্ষের কী দশা। আমরা পুরোপুরি অহিংস। যুদ্ধ করি অথচ আমাদের এটম-বোমা নেই। ক্রিকেট খেলি, নেই আমাদের পেস-বউলার। আমরা শুধু 'নিসার'—'নিশার স্বপন' দেখি।

ক্রিকেটের দর্শন

প্রথম বলেই আউট।

এরকম হয় নাকি ?

খুব হয়। শুধু এক ইনিংসে নয়, দু ইনিংসেই হয়।

'তার মানে ?' বাসন্তী ভুরু তুলল।

এরও মানে বলে দিতে হবে। বললাম, 'প্রথম ইনিংসে প্রথম বলে আউট, দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রথম বলে আউট।'

'একই ব্যাটসম্যান ?' বাসন্তীর দুই ভুরু এক লাইনে এসে গেল।

'নিশ্চয়ই। একই ব্যাটসম্যান। নইলে বলবার মত হবে কেন ?' আশ্বস্ত করতে চাইলাম।

'স্রেফ গাঁজা—গুল—গ্যাস।' অনামিকা তড়পে উঠল: 'ও সেই বাঘের দাড়িতে হাত বুলোনোর গল্প।'

'গল্প ?' ক্রিকেটের বইয়ের দিকে হাত বাড়ালাম।

'রাখো'। বাসন্তী ধমকে উঠল। বললে, 'তার চেয়ে হাত বুলোনোর গল্পটা শুনি। অনামুখি, বল না গল্পটা কি।' সখী অনামিকাকে ঠেলা মারল।

'ক্লাবে একজন তার বাঘ শিকারের গল্প বলছে।' বলতে লাগল অনামিকা, 'বলছে, দেখলাম একটা বিরাট বাঘ নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে। নদীর ধারে কটা গাঁয়ের মেয়ে বসে কাপড় কাচছিল। বাঘ প্রায় ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা মেয়ে সাহস করে খানিকটা জল বাঘের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিলে, আর বাঘটা অমনি ভালোমানুষের মত গুটিসুটি পালিয়ে গেল। ক্লাবের আরেকজন সভ্য উঠে বললে, আপনারা হাসবেন না, বন্ধু যা বললেন তা খাঁটি সত্যি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আপনি দেখেছেন ? হ্যাঁ,

আমি ঐ পথ দিয়ে তখন আসছিলাম আমার সঙ্গে বাঘের দেখা হল, আর তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখলাম, দাড়ি ভিজে।'

বড়ো বড়ো কালো চোখ আরো বড়ো বড়ো করে বাসন্তী হাসতে লাগল।

'তার মানে কী হল?' বিরক্ত হলাম।

'মানে হল, আমাদের আনাড়ি পেয়ে তুমি যা-খুশি চাল মারো।'

'তোমরা যে আনাড়ি তাতে আর সন্দেহ কী। আদি হতেই যা নারী তাই আনাড়ি।' এবার ওদের বিরক্ত হবার পালা—তা কী করা যাবে! বললাম, 'দাঁড়াও, বই দেখাই। ক্রিকেটেব বই।'

'রক্ষে কবো, এমনি বলো।' অনামিকা ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে বললে, 'তোমাকে বই দেখাতে হবে না।'

'অনামুখি, সবি—সোনামুখি, এভরিথিং ইজ ইন বুক অফ ক্রিকেট।' আদর মিশিয়ে বললাম।

'জানিস এটা হল দর্শনের কথা।' দর্শনের ছাত্রী বাসন্তী গম্ভীর স্বরে কথাটার পুনরুক্তি করলে: 'এভরিথিং ইজ ইন বুক অফ ক্রিকেট।'

'হ্যাঁ, সমস্তই জীবনের পুঁথিতে, ক্রিকেটেব পুঁথিতে লেখা থাকে। শুধু দু ইনিংসেই শূন্য করা নয়, দু ইনিংসেই প্রথম বলেই শূন্য করা।'

'কই ব্যাটসম্যানের নাম তো বললে না!' বাসন্তী চঞ্চল হয়ে উঠল।

'বলছি। ব্যাটসম্যানের নাম সাউথ আফ্রিকাব ওয়েসলি। কাণ্ডটা ঘটেছিল ট্রেন্ট ব্রিজএ, ১৯৬০ সালে, টেস্টে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। দু দুবারই প্রথম বলেই বউলড।'

'বউলার কে? লারউড?' জিজ্ঞেস করলে অনামিকা।

'উনিশ শো ষাট সালে লারউড কোথায়? বউলার স্ট্যাথাম। আবার এও দেখ,' ক্রিকেটের বইয়ের দিকে হাত বাড়ালাম: 'প্রথম

বল স্ট্যাম্পে এসে লাগল কিন্তু বেল পড়ল না—তাই আউট হল না ব্যাটসম্যান, কিন্তু কে জানত সেই যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখে ফেরত আসা ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করবে ?'

'বলো কী, টেস্টে ?' লাফিয়ে উঠল বাসন্তী।

'হ্যাঁ, টেস্টে বই কি। সেই সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।'

'আহা, ব্যাটসম্যানের নামটা বলো না।' অনামিকা উসখুস করে উঠল।

'ইংরেজ ব্যাটসম্যান, দুর্ধর্ষ উলি, ফ্র্যাঙ্ক এডওয়ার্ড উলি, ১৯২৩ এ, জোহান্সবার্গে। তা হলে দেখতে পাচ্ছ—এও ক্রিকেটের পুঁথিতে, জীবনের পুঁথিতে আছে, মরতে-মরতে বেঁচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকা। সেই টেস্টে উলি ১১৫ করে নট-আউট। যার প্রথম বলেই গেট-আউট হবার কথা সে শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরি করে নট-আউট থাকল। সমস্তই ক্রিকেট।'

'তা হলে দাঁড়াল কী ?' দু সখীই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'দাঁড়াল—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি।' চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলাম: 'যাকে বলে কিনা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

'সে কী!' দুজনেই হতাশ মুখ করল: 'সকাল বেলায়ই ধর্ম কথা সুরু করবে নাকি ?'

হাসলাম: 'ধর্ম ছাড়া কথা কই ? যা কিছু ধরে আছ, তোমাদের জীবনের চলতি ট্র্যামে বাসএ যা-ই তোমাদের হাতল, ধরে ওঠবার বা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার উপায়—সবই তো ধর্ম।'

'কি আশ্চর্য, ক্রিকেটের কথা হচ্ছিল,' বাসন্তী বিরক্ত মুখে বললে, 'সেখানেও তুমি ধর্ম টেনে আনলে।'

'নিশ্চয়ই। ক্রিকেটই তো কুরুক্ষেত্র। একমাত্র ক্রিকেটই তো শেখায় স্থিতধী হতে। স্থিতধী কাকে বলে জানো ?' অনামিকার দিকে তাকালাম।

'মানে, যাকে বলে মাথা-ঠাণ্ডা।' মুচকে হাসল অনামিকা: 'তাই না?'

'কতকটা তাই। স্থিরবুদ্ধি। স্থিতপ্রজ্ঞ।'

'ভীষণ খটমট।' বাসন্তী আপত্তি করল।

'ব্যাটে-বলের ব্যাপার, খটমট তো হবেই।' স্বর দৃঢ়তর করলাম: 'কঠিনের খেলা—শব্দও কঠিন হতে বাধ্য। যে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ, সেই স্থিতধী। যে প্রাপ্য পেয়ে আনন্দিত হয় না, প্রাপ্য না পেয়েও অসন্তুষ্ট হয় না, যে অনুরাগ ও বিদ্বেষ দুই থেকেই মুক্ত, তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তাই ওয়েসলিব হতাশা নেই, উলির উল্লাস নেই— দুজনেই স্থিতধী, সত্যিকার ক্রিকেটার।'

দু সখী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। স্থিতশ্রী হয়ে বসে থাকবে কিনা, না কি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে বোধহয় তারই ক্ষণিকচকিত পবামর্শ।

বললাম, 'স্থিব হয়ে বসো। তুমি বাসন্তী, পূজাব বাসনটির মত বসো আর তুমি অনামুখি সোনামুখী হয়ে শোনো।'

সোফায় বসা সখীরা ভঙ্গি শিথিল না করে পারল না।

'ব্রিটিশ সভ্যতা আমাদের কী কী দিয়েছে জানো? এক, ব্যালট বক্স; দুই, লিমিটেড কোম্পানি; তিন, বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ, আর—'

মুখের কথা কেড়ে নিল বাসন্তী: 'আর—চার, ক্রিকেট।'

'তা বলতে পারো নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্রিকেটের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের।'

'আমাদের মানে?' অনামিকা জিজ্ঞেস করল।

'ভারতবর্ষের। শ্রীমৎ ভগবৎগীতার।'

দু সখী অবার বিমর্ষ চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। যেন সাত সকালে দুঃসংবাদ শুনছে।

আমি দমলাম না। বললাম, 'গীতার মত ক্রিকেট প্রথমেই আমাদের তুটো জিনিস হতে শেখায়। এক নির্মম, আরেক নিরহঙ্কার—'

'নির্মম—মানে নিষ্ঠুর হতে শেখায়?' লাফিয়ে উঠল বাসন্তী।

'তা ছাড়া আবার কী।' ভাষ্য জুড়ল অনামিকা: 'পিটিয়ে পিটিয়ে বল ছাতু করে দিচ্ছে আবার বলও ব্যাটসম্যানের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, পাঁজরা গুঁড়ো করে দিচ্ছে, থুতনি থেঁতলে দিচ্ছে—তু পঁথই সমান কাঠ, সমান নির্মম।'

'তা—এক অর্থে তাই বটে।' ইচ্ছে ছিল না তবু সঙ্গগুণে একটু লঘু হতে হল। বললাম, 'তু পক্ষই সমান কাঠ। এ পক্ষে লারউডের উড, ওপক্ষে উডফুলের উড। কিন্তু নির্মমের আসল অর্থ মমতাশূন্য, স্বার্থশূন্য। আমার মার, আমার বান, আমার নাম-যশ এই অহং-বুদ্ধিই মমতা। ক্রিকেট এই মমতাভ্রম দূব করে।'

'বলো কী', চোখ কপালে তুলল বাসন্তী: 'তা হলে বান হবে কী করে?'

'পূজার বাসনটির মতো বসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' আবার পুবোনো গাম্ভীর্যে ফিরে গেলাম: 'বান করতে হলে একা হয় না, আরেক-জনেব দরকার হয়। তু প্রান্তে তু ব্যাটসম্যান--একজন মেরে ছোটে, আরকজন অমনি অমনি ছোটে। দ্বিতীয় জন না ছুটে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে রান হয় না। বামেব রানের জন্যে লক্ষ্মণকে ছুটতে হয়। এখানে লক্ষ্মণেব ছোটা একেবারে নিঃস্বার্থ ছোটা। হয়তো বাউণ্ডারির চার-চারটা রানই ছুটে আদায় কবতে হল। লক্ষ্মণ ছুটে-ছুটে ক্লান্ত হল যাতে কিনা রামের চাবটে রান হয়। এইটেই গীতার শিক্ষা। পরের জন্যে ছোটো, পরেব প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হও। কী বলছে গীতা? 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।' যদি লক্ষ্মণ না ছোটে বা ছুটতে গড়িমসি করে তা হলে রাম রান-আউট।'

'তেমনি রামও লক্ষ্মণকে রান-আউট করে দিতে পারে।' অনামিকা বললে।

'পারেই তো। কিন্তু করে না কেননা সেটা ক্রিকেট হবে না। ক্রিকেটই শেখায় পরার্থপর হতে। পরের জন্যে ক্লান্ত হতে। তেমনি ধরো, ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ধরছে। ক্যাচ ধরবার জন্যে তার কত মেহনৎ, কত বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। তবু সে কিছু গ্রাহ্য করবে না, নিজের দিকে তাকাবে না, কখনো ছোঁ মেরে কখনো সাষ্টাঙ্গ হয়ে কখনো বা ডিগবাজি খেয়ে সে ক্যাচ লুফবে। হয়তো তাতে তার কব্জি ভেঙে গেল, কলারবোন বা কণ্ঠাস্থি টুটুকরো। না, সে নিজের জন্যে খেলছে না, সে দলের জন্যে খেলছে, খেলার জন্যে খেলছে। বাম্পার বলে কি শুধু ব্যাটসম্যানেরই মাথা ফাটে? না, কখনো-কখনো নিজের দলের উইকেটকিপারেরও মাথা ফাটে। তার জন্যে উইকেটকিপার কি সরে গিয়ে 'বাই' দেয়? ককখনো না। যাক মাথা, তবু প্রাণপণে সে বল আটকায়। এটাই গীতার শিক্ষা। যুদ্ধ করতে এসেছ, নিরঙ্কুশ যুদ্ধ করে যাও। 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।' যারা শুধু ফলের জন্যে, নিজের জন্যে লড়ে তারাই দীন, তারাই কৃপার পাত্র। নইলে বলো, যে ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ধরতে নিজেকে জখম করছে, সে এই ক্যাচের বেনিফিট পাবে না, পাবে বউলার, তারই এভারেজ উজ্জ্বল হবে। ভাবো যে ক্যাচ ধরল তার গুণ নয়, যার বলে ক্যাচ উঠল তার গুণ। তবু পরের মুখ উজ্জ্বল কববার জন্যে নিজের মুখ রক্তাক্ত করার মহানুভবতার শিক্ষক এই ক্রিকেট।'

'আর যদি ক্যাচ মিস করে?' বাসন্তী চোখে ঝিলিক মারল।

'ওরে বাবাঃ, যদি হোম-সাইড ফিল্ডিং করতে নেমে থাকে তবে চারদিকের স্বদেশী দর্শকেরা তাকে গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়াবে। শুধু গালাগাল? তাকে লক্ষ্য করে ঢিল-পাটকেল না হোক আস্ত কমলা নেবু ছুঁড়ে মারবে। যতক্ষণ সে মাঠে ততক্ষণই সে কাঠগড়ায়।'

'অথচ যার বলে ক্যাচটা ফলবন্ত হল না সেই বউলারকে কেউ দুষবে না।' অনামিকা বেশ মজা পাচ্ছে তাই অমনি করে বললে।

'বা, বউলারের দোষ কী।' বাসন্তী ঝাপটা মারল।

'ক্যাচটা ধরা পড়লে যদি তার বাহাদুরি হয়, তা হলে ক্যাচটা ছাড়া হলে তারই কেলেঙ্কারি হওয়া উচিত।'

'কিন্তু তার যে এভারেজটা উজ্জ্বলতর হতে পারল না এই তার দুর্ভাগ্য। কিন্তু কথাটা ও দিক থেকে দেখবে না।' বিশদ হবার চেষ্টা করলাম: 'বিষয়টা হচ্ছে পরের জন্যে স্বার্থত্যাগ বা আত্মদান, এইটেই ক্রিকেটের ভিত্তি। ক্রিকেটেই শেখায় কী করে একে অন্যের অংশীদার হতে হয়, কাকে বলে পার্টনারশিপ বিজনেস। যেমন ধরো ব্র্যাডম্যানের পার্টনার পনসফোর্ড। উনিশ শো চৌত্রিশে ওভ্যালে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেকেণ্ড উইকেটে ৪৫১, আবার লীডসএ ফোর্থ উইকেটে ৩৮৮। জানো তো দুটোই রেকর্ড পার্টনারশিপ। তেমনি ইংলণ্ডের হাটন আর ওয়াশব্রুক। সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯৪৮-৪৯এ ফার্স্ট উইকেটে ৩৫৯। মে আর কাউড্রে ১৯৫৭-য় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ফোর্থ উইকেটে ৪১১। আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পার্টনার সোবার্স আর ওরেল, ১৯৬০এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফোর্থ উইকেটে ৩৯৯।'

'আমাদের ভারতবর্ষের কেউ নেই?' বাসন্তী ঝিলকিয়ে উঠল।

'আছে বৈকি। আমাদের মার্চেন্ট আর মাস্তাক আলি, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, ম্যাঞ্চেস্টারে, ১৯৩৬এ, ফার্স্ট উইকেটে ২০৩। আবার মানকড় আর হাজারে, সেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, লর্ডসে, ১৯৫২-য়, থার্ড উইকেটে ২১১। তেমনি মাদ্রাজে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফার্স্ট উইকেটে ১৯৫৫-৫৬-য় ৪১৩, আমাদের পঙ্কজ আর মানকড়। আর আজ পর্যন্ত ফার্স্ট উইকেটে এইটেই ওয়ার্লড রেকর্ড।'

'সত্যি।' সায় দিল অনামিকা: 'পরস্পর বোঝাবুঝি না থাকলে এত সব রেকর্ড হয় না।'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যে আমি, আমার জন্যে তুমি, এই কমরেডশিপ এই সাহচর্যেরই শিক্ষক ক্রিকেট।' একবার বাসন-টি আরেকবার সোনামুখীর দিকে তাকালাম: 'যেমন সমবুদ্ধি ব্যাটসম্যানে-ব্যাটস-ম্যানে তেমনি আবার বউলারে-উইকেট কিপারে। লিণ্ডওয়ালের অংশীদার তেমনি ট্যালন, লেকারের অংশীদার ইভান্স, হল-এর অংশীদার আলেকজাণ্ডার। সক্রিয় ও সহযোগী অংশীদার ছাড়া কোনো যুদ্ধেই জয়লাভ করা যায় না, না মহাভারতের যুদ্ধ, না বা স্বাধীনতার।'

'সেটা আবার কী রকম হল?' বাসন্তী গলাটা উঁচু করে ধরল।

'মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণের পার্টনার ছিল অর্জুন, আর ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে গান্ধির পার্টনার নেহরু, চিত্তরঞ্জনের পার্টনার সুভাষ। কী, ঠিক বলছি না?'

'চমৎকার বলেছ তো', অনামিকা উৎসাহিত হয়ে উঠল: 'একজন হাল ধরে থাকে আরেকজন দাঁড় বায়।'

'ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে একজন স্ট্রাইকার আরেকজন নাইটওয়াচম্যান।' বাসন্তী জান্তা গলায় বললে।

'বলতে পারো ও ভাবে। কিন্তু কে কখন হিট করবে, কে বা কখন শুধু ব্লক করে যাবে তাও দুজনের মধ্যে নিখুঁত বোঝাপড়া দরকার। ননস্ট্রাইকার কৃষ্ণকেও ভীষ্মবধে রথের চাকা ছুঁড়তে হয়েছিল। মোটকথা এই সখ্য এই মিত্রতার পাঠই ক্রিকেট মাঠে। যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আর ধনুর্ধর অর্জুনের সহযোগ সেখানেই শ্রী, সেখানেই জয়, সেখানেই ঐশ্বর্য।'

'এই তো হল এক দিক। আর কী শেখায় ক্রিকেট?' অনামিকার চোখে শ্রদ্ধা জাগছে মনে হল।

'হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলা হয় নি। ক্রিকেট নিরহঙ্কার হতে শেখায়, বিনয়ী হতে শেখায়। কিছুই বলা যায় না, তুমি সেঞ্চুরি করা সত্ত্বেও জিরো করতে পারো—এমন কি দু ইনিংসেই জিরো।

স্বয়ং ক্যাপ্টেনেরও "পেয়ার" থেকে ছাড় নেই। "পেয়ার" কাকে বলে জানো তো?'

'জানি।' মুচকে হাসল বাসন্তী: 'ছু ইনিংসেই গোল্লা। পেয়ার অফ স্পেকটাকলস। কিন্তু ক্যাপ্টেন হিসেবে কার এমন দুর্গতি হল?'

'কার নয় বলো? ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন ডার্লিং, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন বেনো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন ওরেল, পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ—কেউ ছাড় পায় নি।'

'আর আমাদের ক্যাপ্টেন?' এ অনামিকার জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ, আমাদের ক্যাপ্টেনের অদৃষ্টেও জুটেছে এই জোড়া ডিম। আর তার নাম হাজারে। সুতরাং অহঙ্কারের আর স্থান কই? কে বলতে পারে, হবেই হবে, পারবই পারব। কেউ পারে না। তাই বিনয় আসে। তাই গীতায় যা বলেছে—ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ—'

'একেবারে নিরাশ্রয়?' বাসন্তী গালে হাত দিল।

'তা ছাড়া আবার কী! বল চোখেও দেখলে না, আউট হয়ে গেলে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ক্যাচটা ধরা যায়, এত সোজা,—তাই ফেলে দিলে কার্পেটের উপর। সেবার ট্রেভর বেইলির কী হল? শ্লিপে তিন জন, গালিতে ছু জন, কভারে এক জন, শর্ট লেগে তিন জনকে দাঁড় করিয়ে বল দিচ্ছে বেইলি। হুক করতে গিয়ে ব্যাটসম্যান তার মাথার উপরে শূন্যে ক্যাচ তুলে দিয়েছে। উইকেটকিপার তো পারেই, আশে-পাশের যে কোনো ফিল্ডসম্যানই লুফতে পারে অনায়াসে। কিন্তু কে ধরে তাই নিয়ে এক মুহূর্ত হয়তো দ্বিধা জেগেছে সকলের মধ্যে। 'আমি'—বজ্রস্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বেইলি আর সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্যুতের মত ছুটল বলটা ধরতে। সবাই পথ থেকে সরে দাঁড়াল, নির্বিবাদে বেইলিই ধরুক। কিন্তু কী করল বেইলি? বলের তলায় এসে দাঁড়াবার আগেই

পড়ল মুখ থুবড়ে, বলটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে এক বিন্দু ছুঁতে পারল মাত্র। কী, আমি—অহং—টিকল এই অহংকার? বেইলি পরে আর কোনো দিন পেরেছে আত্মঘোষণা করতে?'

'কিন্তু যখন কোনো ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করে সেটা তার স্বকৃত কৃতিত্ব নয়?' শান্ত চোখে জিজ্ঞেস করল অনামিকা।

'হ্যাঁ, কৃতিত্ব বৈ কি, কিন্তু সেটা ব্যাটসম্যান অহংকর্তৃত্ব বলে মনে করে না। মনে করে ভাগ্যের কৃপা।' হাসলাম: 'ভগবান না বলে ভাগ্য বলে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য পষ্টাপষ্টি ভগবান বলেছেন।'

'এখানে—ক্রিকেটেও শ্রীচৈতন্য?' বাসন্তী আরেক গালে আরেক হাত রাখল।

বললাম, 'যেখানেই চেতনা আছে, প্রকট বা প্রচ্ছন্ন, সেখানেই শ্রীচৈতন্য।'

অনামিকা দীপ্ত চোখে জিজ্ঞেস করলে, 'কী বলেছেন মহাপ্রভু?'

'বলেছেন যা কিছু আমাদের দুঃখকষ্ট পরাজয় বৈফল্য, সমস্ত আমাদের স্বকৃত কর্মের বিপাক আর যা কিছু আমাদের সুখ শান্তি সাফল্য সমৃদ্ধি, সমস্ত ভগবানের কৃপা। তাই ব্যাটসম্যান জিরো করলে বা অল্প রানে আউট হলে মনে করে নিজের ভুল, নিজের অপরাধ, নিজের মূর্খতা, আর সেঞ্চুরি করলে মনে করে ভাগ্যের দান ভাগ্যের বদান্যতা। ক্রিকেটই নিরহঙ্কার ও নিরাসক্ত হয়ে কাজ করতে শেখায়, আর, মুখে যতই চালাকি করুক, অন্তরে-অন্তরে ভগবৎবিশ্বাসী করে তোলে। 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর। অসক্তোহ্যাচরন কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥' '

'এই পরম বলতে পূর্ণ না হয়ে শূন্যও হতে পারে।' চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক মারল বাসন্তী।

'হোক। শূন্যে পূর্ণে সমবুদ্ধি এইটেই পরম প্রাপ্তি। শীত-উষ্ণ দুঃখ-সুখ নিন্দা-স্তুতি সমস্ত সমান। ক্রিকেট আরো শেখায়। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু। শেখায় ক্ষমা করতে। 'সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।'

'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' কিংবা 'যদৃচ্ছলাভসন্তুষ্টঃ।' তোমার বলের ক্যাচ যদি তোমার দলের লোক ফেলে দেয়, তো তাকে ক্ষমা করো। আর যদি অল্প রান করে আউট হও, ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো যে ফার্স্ট বলেই জিরো করোনি।'

'ঠিক।' গাঢ় স্বরে প্রতিধ্বনিত হল অনামিকা: 'যা আমরা চাই তা সব সময়ে পাই না বটে কিন্তু যা পাই সব সময়ে তারও আমরা যোগ্য নই।'

'তাই আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই।' হাসল বাসন্তী: 'ক্রিকেট না দেখেও ক্রিকেটের দর্শন জানি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ক্রিকেটের দর্শন।' বলতে বলতে উঠে পড়লাম: 'ক্রিকেটই তো শেখায় অভ্যাসযোগ, শেখায় অনন্যচিত্ততা, শেখায় আত্মসংযম। শেখায় উদার হতে, সত্যবাদী হতে, অপক্ষপাত হতে। আর সব যাক, ক্রিকেট থাকুক।'

কে যেন বলেছে, গীতা এক কথায় 'ওয়ার্ক', মানে কর্ম। কিন্তু গীতা কর্মের চেয়েও কিছু বেশি। গীতা এক কথায়—ক্রিকেট।

ক্রিকেটে গান্ধি ও নেহরু

'গান্ধি, তোমার্ ছাগল কোথায়?'

সিডনির ক্রিকেট মাঠে পাটাউডির নবাব দড়ির কাছে ফিল্ডিং করছে, জনতা বারে বারে একই প্রশ্নে তাকে বিরক্ত করছে: গান্ধি, তোমার ছাগল কোথায়?

অস্ট্রেলিয়ার জনতার কাছে হিন্দু-মুসলমান নেই, ভারতবর্ষের লোক হলেই সে গান্ধি। আর, কী দুর্জয় সাহস সেই ভারতীয়ের, বিলেতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছে, শুধু 'অর্ধনগ্ন ফকিরের' বেশে নয়, ট্যাঁক-ঘড়ি ঝুলিয়ে, সঙ্গে একটা ছাগল নিয়ে। কে জানে যদি বিলেতে তার প্রাত্যহিক পানীয় ছাগলের দুধ পাওয়া না যায়। তারই জন্যে জনতার পরিহাস। 'গান্ধি, তোমার ছাগল কোথায়?'

বার বার শুনে শুনে তিক্তবিরক্ত হল নবাব। শেষে ফিরিয়ে দিল। বললে, 'ছাগল তো তোমাদের মধ্যে।'

'আমাদের মধ্যে?' জনতা কৌতূহলী হল: 'কী করে বুঝলে?'

'তোমাদের গন্ধ থেকে।'

অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে। ছাগুলে বুদ্ধি আর কতদূর যাবে!

ক্রিকেটের মাঠেই তো গান্ধির নাম উচ্চারিত হবে। কেননা গান্ধি একজন খাঁটি ক্রিকেটার। চিরকাল 'স্ট্রেট ব্যাটে' সরল সততার সঙ্গে খেলে গেছে।

ক্রিকেটে অফসাইড থেকে গোল দেওয়া নেই। ক্রিকেটে প্রাপ্তিই শুধু মহৎ নয় পদ্ধতিও মহৎ। সে মহৎ খেলাই খেলে

গেছে গান্ধি। যদি বুঝেছে বল তার ব্যাট ছোঁবার পর উইকেট-কিপারের হাতে ধরা পড়েছে, তাহলে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা না করেই সোজা হেঁটে চলে গিয়েছে তাঁবুতে। আম্পায়ার নট-আউট বললেও ফেরেনি। আম্পায়ারের চেয়েও বড় বিচারক বিবেক।

রাজকোটের এলফ্রেড হাইস্কুলে ক্রিকেট খেলেছে গান্ধি। বাধ্য হয়েই খেলেছে। হেডমাস্টার নিয়ম জারি করেছে প্রত্যেক ছাত্রকে কোনো না কোনো শারীরিক ব্যায়াম অভ্যেস করতে হবে, খেলতে হবে হয় ক্রিকেট নয় ফুটবল। গান্ধি শারীরিক ব্যায়াম বা খেলাধূলার ধারেকাছেও ঘেঁসতে চাইত না, কিন্তু এখন কী করবে, হেডমাস্টারের হুকুম, ধরতেই হবে ব্যাট, নয় তো ছুঁড়তেই হবে বল। সকলে অবাক হয়ে গেল, ব্যাটে-বলে ছুয়েতেই সমান দক্ষ হয়ে উঠল গান্ধি। তার ছাত্রজীবনের বন্ধু রতিলাল মেটা বলছে, বলে যেমন কুশলী ব্যাটেও তেমনি পরাক্রান্ত। কে বলবে নতুন খেলছে, কে বলবে এই প্রথম মাঠে নামল!

যাতে হাত দেবে তাকেই সত্তার সঙ্গে অনুস্যূত করে নেবে।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজনৈতিক জীবনটাই গান্ধি ক্রিকেট করে তুলল। দেখাল ক্রিকেটারই সত্যিকার ভদ্রলোক। আরো বেশি —ক্রিকেটারই সত্যিকার সৎ।

উনিশ শো তেত্রিশ-চৌত্রিশে জার্ডিনের এম সি সি দল ভারত-ভ্রমণে এসেছে। গান্ধি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করছে —সে সংগ্রামেও তার ক্রিকেটারের পরিচ্ছন্নতা, সেখানেও সে পুরো-দস্তুর ক্রিকেটার। বিজয় মার্চেন্টের বোন লক্ষ্মী মার্চেন্ট গান্ধির সামনে তার অটোগ্রাফের খাতা ধরেছে—মহাত্মার একটা সই চাই। আর কার কার সই নিয়েছে, খাতার পৃষ্ঠাগুলো উলটে উলটে দেখতে লাগল গান্ধি। এম সি সি-র দলে ষোলো জন খেলোয়াড়, দেখল

পর পর পৃষ্ঠায় এই ষোলো জনের দস্তখৎ। গান্ধি সতেরো নম্বর পৃষ্ঠায় নিজের নাম লিখল আর লিখল, 'সেভেনটিন্থ্ প্লেয়ার অফ দি এম সি সি টিম' অর্থাৎ এম সি সি দলের সতেরো নম্বরের খেলোয়াড়। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের জন্যে সে লড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্রিকেটে সে ইংরেজদেরই একজন। যেমন রঞ্জি, যেমন দলীপ, যেমন পাটাউডির নবাব।

অর্থাৎ গান্ধি ক্রিকেটেরই এক মন্ত্রসিদ্ধ সৎপুরুষ।

তোমার এই ব্যবহারে তুমি অনুদার, তুমি অপরিচ্ছন্ন, তুমি অসাধু—এরই সংক্ষিপ্ত ইংরিজি বাগভঙ্গি—'ইট ইজ নট ক্রিকেট। যা অবিধেয় তাই অ-ক্রিকেট। ইট ইজ নট ক্রিকেটের ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে যাথার্থ্য থেকে বিচ্যুতি চলবে না, যা ন্যায্য তাকে মুক্ত মনে স্বীকার করতে হবে।

কথা দিয়ে কথা রাখবে না, এটা ক্রিকেট নয়। ট্রেনে যাবে অথচ টিকেট কাটবে না, এটাও ক্রিকেট নয়। পাশ ফেল যা হয় হবে, যেমন তৈরি হয়েছি তেমনি পরীক্ষা দিয়ে যাব—এইটেই ক্রিকেট, পকেটে বই নিয়ে যাব আর তাই দেখে টুকব, এটা তো ক্রিকেট নয়ই। যা কিছু ফাঁকি, মেকি, চাতুরি বা ছলনা তাই অসুজন। ক্রিকেট মানেই সৌজন্য। সৌশীল্য।

গায়ের জোরে তিব্বতের মধ্যে চীনের ঢুকে পড়াটা ক্রিকেট নয়। তেমনি ক্রিকেট নয় চীনের ভারত-আক্রমণ। যুগ যুগ ধরে সীমান্ত মেনে এসে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ চীনের দাবি করে বসাও ক্রিকেট নয়।

গান্ধির সেই কুইট ইণ্ডিয়া মন্ত্রও এই ক্রিকেটের উপর দাঁড় করানো। বাড়িটা আমার, তুমি ইংরেজ, গায়ের জোরে দখল করে আছ, তোমার কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই, তুমি অনধিকারী, তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি, তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। যদি বলো তুমি ভাড়াটে, তোমার মেয়াদ অনেক দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে,

নোটিশ দিচ্ছি, সরে পড়ো, আস্তানা গুটোও। তোমার কোনো অধিকার নেই পরের ধনে পোদ্দারি করো। উড়ে এসে জুড়ে বসা বা পরের ঘিয়ে নিজের প্রদীপ জ্বালানো ক্রিকেট নয়। মন্ত্রটার মধ্যে এমন একটা ন্যায়ের কথা আছে, যে শুধু ইংরেজের নয়, বিশ্বমানবের বুকের মধ্যে ঘা পড়ল।

সত্যিই তো, তুমি বিদেশী ইংরেজ, তুমি কেন আমাদের উপর মাতব্বরি চালাবে? বাণিজ্য করতে এসে দিব্যি রাজ্য পেতে বসবে এটা ক্রিকেট নয়। আমরা আমাদের নিজেদের বাড়িতে যেমন খুশি থাকব, তাতে তোমার কী মাথাব্যথা? আমাদের সংসার ভালোমত চলবে না, আমরা আনাড়ি অপক্ব, তাতে তোমার কী? আমার পাঁঠা আমি মুণ্ডে কাটি কি পুচ্ছে কাটি তাতে কথা বলতে আসবে, তুমি কে? তুমি কেটে পড়ো। কুইট ইণ্ডিয়া। আমরা আমাদের বাড়িতে তোমাকে আর রাখতে চাচ্ছি না সত্ত্বেও তুমি থাকবে এটা ক্রিকেটের কোনো পৃষ্ঠায় লেখে না। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান করো।

মন্ত্রটা প্রগাঢ় একটা সত্যের উপর ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারই জন্যে আসমুদ্রহিমাচল এত বড় একটা জোরের জোয়ার সম্ভব হল। আম্পায়ার আউট দেবার পরেও যে ব্যাটসম্যান ক্রিজে দ্বিধাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকে সে ক্রিকেটার নয়।

গান্ধি খাঁটি ক্রিকেটার বলে ঐ মন্ত্রটা বার করতে পেরেছিল। ভারত ছাড়ো। তুমি ইংরেজ, ক্রিকেট তোমার জাতীয় খেলা, কী করে তুমি বিদেশী অনধিকারী হয়ে অপরের ঘাড়ে চেপে থাকো। এই রকম নিঃস্বত্ব থাকাটা ক্রিকেট নয়। কুইট ইণ্ডিয়া। জবর দখলকারের নোটিশেও অধিকার নেই। তবু তোমাকে যে নোটিশ দিচ্ছি সেটা আমরা ভদ্রলোক বলে, ক্রিকেটার বলে। তুমিও স্পোর্টসম্যান হও, খেলার মান রাখো। পরের দ্রব্যে দোকানদারি ছাড়ো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

ব্যারাকিং করতে চাও তো করো কিন্তু কাঁচের টুকরোতে রোদ ঠিকরিয়ে ব্যাটসম্যানের চোখের উপর ফেলাটা ক্রিকেট নয়। এমন ব্যাটসম্যানও দেখা গেছে যে ব্যারাকিংএ গোসা হয়ে ওঠে, ব্যারাকিং না থামা পর্যন্ত খেলবে না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভঙ্গিটাও ক্রিকেট নয়। ব্যারাকিং তো খেলারই একটা অংশ, বলা যায়, সর্ত, তার উপর রাগ করলে চলে কী করে? তবে তো এমন বায়নাও করা যায় যে ফিল্ডিং সাইড সকলে একত্র হয়ে 'হাউজাট' বলতে পারবে না। এ সব আপত্তি তো ক্ষুদ্র মনের চাপল্য। এক বার অনেকক্ষণ ধরে ঠুক ঠুক করে খেলছিল বলে অস্ট্রেলিয়ায় হাটনকে ব্যারাক করছিল, হাটন নিদারুণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল বাউণ্ডারির কাছে, যেদিক থেকে আসছিল কোলাহল, গ্যালারিকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনারা কেউ নেমে আসুন, দয়া করে আমার বদলে ব্যাট করুন গিয়ে।'

এ আচরণ ক্রিকেট নয়।

উনিশশো ষাটে বম্বে টেস্টে খেলতে-খেলতে হানিফের পায়ে হঠাৎ টান ধরে। আমাদের ক্যাপ্টেন কন্ট্রাক্টরের কাছে সে একজন রানার চায়। কন্ট্রাক্টর রাজি হয় না। আইনের দিক দিয়ে কন্ট্রাক্টরের আচরণ ·সঙ্গত, কিন্তু সেটা, যাই বলো, ক্রিকেট নয়। ক্রিকেট আইনের চেয়েও বেশি। ক্রিকেট বিবেক।

নইলে ধরো সমস্বরে হাউজাট-এর আপিল হয়েছে, আম্পায়ার 'নো' করে দিয়েছে, আইনত বেঁচে গিয়েছে ব্যাটসম্যান। কিন্তু ব্যাটসম্যান তার অন্তরে জানে বলটা তার ব্যাট ছুঁয়েই ফার্স্ট স্লিপের হাতে ঢুকেছে, মহাকালের বিচারে সে আউট। সে তখন কী করবে? আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সুবিধে নিয়ে সে পরের বলের জন্যে ব্যাট পাতবে না সোজা হাঁটা দেবে প্যাভিলিয়নের দিকে?

সে যদি সত্যিকার ক্রিকেটার হয়, হাঁটা দেবে।

একটা জলের ফোঁটার মত বলটা ব্যাট ছুঁয়েছে কি না। ছুঁয়েছে, লুফে নিয়েছে ফিল্ডসম্যান। সঙ্গে সঙ্গে 'হাউ' করে উঠেছে। আম্পায়ার বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড দেরি করছে, আউট দেবে কি দেবে না। একটু ভেবে-চিন্তে শেষে তার আঙুল তুললে, মানে, আউট দিলে। তখন ব্যাটসম্যান স্বগৃহে যাত্রা করলে।

ফিরে এলে পর তার ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'আসতে দেরি করলে কেন?'

'আম্পায়ের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।' বললে ব্যাঁটসম্যান।

'আম্পায়ারেরর সিদ্ধান্ত! তোমার নিজের কি মনে হল? বলটা ব্যাট ছুঁয়েছিল?'

'এই সামান্য একটু ছুঁয়েছিল।' একটু সামান্যই হাসল ব্যাটসম্যান: 'ভাবলাম কে জানে হয়তো আম্পায়ার বুঝতে পারবে না, তাই একটু দেরি করছিলাম—'

'ছি ছি ছি ছি।' ক্যাপ্টেন শতমুখে ধিক্কার দিয়ে উঠল: তুমি নিজে জানো তুমি আউট, তবু তুমি আম্পায়ারের দিকে তাকিয়েছিলে? তার দেরি হোক, তোমার দেবি হবে কেন? ইট ইজ নট ক্রিকেট।'

ব্যাটসম্যানের সামান্য হাসি চকিতে মিলিয়ে গিয়ে মুখ অসামান্য বিষণ্ণ করে তুলল।

ওনিলের রানারের আবেদনও আমাদেব ক্যাপ্টেন--রামচাঁদ তখন ক্যাপ্টেন--নাকচ করে দিয়েছিল। আইন রামচাঁদের পক্ষে, কিন্তু ক্রিকেট? ক্রিকেট কি বলে একজন অসুস্থ মানুষ সাময়িক সাহায্য চাইলে তাকে দয়া করবে না? কানহাইয়ের রানারের আবেদন অগ্রাহ্য করেছিল পিটার মে। কানহাইয়ের অবশ্যি কিছু নালিশ করবার নেই, মনে-মনে যাই সে বলুক আর ভাবুক। কিন্তু মে চালাক, সে জানে কী করে এই অপ্রসাদ দূর করে দিতে হয়।

সে কানহাইয়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে, বললে, কিছু মনে কোরো না।

এই ভঙ্গিটুকু ক্রিকেট।

উনিশ শো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে, বম্বে টেস্টে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় কী হয়েছিল? ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন গডার্ড আম্পায়ারের কাছে জল খাবার অনুমতি চাইল। সেটা বেটাইম, তাই আম্পায়ার প্রসাদ সিং রাজি হল না। গডার্ডের কিছু বলবার নেই। কিন্তু বললে অমরনাথ, ভারতবর্ষের ক্যাপ্টেন। 'বললে, দিন না জল খেতে। শত্রু হলেও ওরা আমাদের অতিথি, আর তৃষ্ণার্ত অতিথিকে জল না দিয়ে ঘড়ি দেখাবে এটা ভারতবর্ষের আদর্শ নয়।'

প্রসাদ সিং এই যুক্তির উত্তরে কিছু বলতে পারল না। প্রসন্ন হল। দিল জল খেতে।

অমরনাথের সদাশয়তাই ক্রিকেট।

সব চেয়ে দুঃসহ হয়েছিল সেবার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লিয়ারি কনস্টানটাইন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইংলণ্ডে কত দিন তাদের এক সঙ্গে কেটেছে, দুজনে কত পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি হয়েছে। কিন্তু ক্যারাবিয়ানদের দেশে এসে হ্যামণ্ড লিয়ারির থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল, যেন চেনে না, দেখেইনি কোনো দিন। কালোর দেশে এসে তার বোধ হয় মনে পড়ল সে আলোর দেশের লোক, সে উপরতলার। কালো থাকে মাটির নিচে, খনিতে, আর আলো থাকে আকাশে, সূর্য-চন্দ্র হয়ে। আলোয়-কালোয় মিশ খাবে কী করে?

হৃদয়ের থেকেও বড় হয়ে উঠল গায়ের চামড়া। হ্যামণ্ডের এ আচরণকে কে ক্রিকেট বলবে?

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। হ্যামণ্ড ব্যাট করছে, কনস্টানটাইন বল করতে এল। বউলিং ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে দুর্ধর্ষ জোরে হ্যামণ্ডের শরীর লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। কেমন, চিনতে পারো এবার? বল

হ্যামণ্ডের চিবুকে এসে লাগল, হ্যামণ্ড পড়ল মুখ থুবড়ে। ছুটল রক্ত-গঙ্গা। কি, রক্ত কি একই রকম লাল মনে হয়? না কি তোমার রক্ত শাদা আর আমার রক্ত কালো?

আম্পায়ার কী করতে পারে? আম্পায়ার বড় জোর নো-বল ডাকল।

কিন্তু কে না বলবে কনস্টানটাইনের আচরণ ক্রিকেট নয়। অসভ্যতার উত্তর অসভ্যতা নয়। সঙ্কীর্ণতার উত্তরে নাও আমার ঔদার্যের প্রসাদ।

মহাত্মার যুদ্ধেও এই নির্বৈর মন্ত্র। তার হৃদয় প্রশস্ত বলে ব্যাটও চওড়া। তার প্রাপ্তি যেমন মহৎ পথও তেমনি মহৎ। একটা দানবীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে সে লড়ছে, তাই বলে তুমি ইংরেজ, তুমি আমার কাছে দানব নও। বাম্পার-বিমারে আমি ভয় পাই না, গায়ে-মাথায় লাগতে হলে লাগবে, সাহসে নিঃস্ব হব না, আম্পায়ারের আড়ালে গিয়ে মুখ লুকোব না কখনো। অমি যুদ্ধ করতে নেমেও ভুলি না যে আমি ভদ্রলোক। ক্রিকেটের মাঠের বাইরে এসেও আমি ভুলি না যে আমি ক্রিকেটার।

আর নেহরু—নেহরু কী করল?

দিল্লিতে প্রধান মন্ত্রীর দলের সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্টের একাদশের খেলা হচ্ছে। সাল ১৯৫৩, বন্যার্তদের সাহায্যে চ্যারিটি ম্যাচ। এক দলের ক্যাপ্টেন নেহরু আরেক দলের ক্যাপ্টেন রাধাকৃষ্ণান।

টসে নেহরু, যাকে বলে, ঠিকমত ডাকল—'কলড করেক্টলি'। অর্থাৎ সে যা বলল তাই পড়ল। তার মানে সে টসে জিতল। ভালো ক্যাপ্টেনের কাজই হচ্ছে টসে জেতা।

তারপর কী করল? নেহরু ব্যাটিং নিল। ভালো ক্যাপ্টেনের মতই নেহরু জানে, যে 'ফার্স্ট নক ইজ দি বেস্ট নক'—প্রথম মারই আসল মার।

ক্রিকেটের বেলায় ওস্তাদের মার প্রথম রাত্রেই।

নেহরু যখন ব্যাট করতে এল তখন তার পার্টনার কমিউনিস্ট নেতা গোপালন। ক্রিকেটে পার্টনার হতে কিছুমাত্র আটকাল না, দুজনের মধ্যে রান নেওয়ার বোঝাপড়া দেখে সবাই অবাক মানল।

অত ঠুকঠুকিয়ে খেলতে রাজি নয় নেহরু। মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে—অমন শিকারী হয়ে লাভ কী? একটা মার মেরেই রানের জন্য ছুটল। সেটা ফিল্ডসম্যানের হাত গলিয়েছে কিনা দেখল না, পুজো শেষ হবার আগেই বর মেগে বসল। ছুটে গিয়ে দেখল ঐ মারে রান নেই, রান হয় না। তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইল তার ক্রিজে। তার আগেই বল উইকেটকিপার ব্যারোর হাতে চলে এসেছে। নেহরু নির্ঘাত রান-আউট। কিন্তু ব্যারো কী করল? তার গ্রেসের কথা মনে পড়ল। নেহরুকে যদি সে রান-আউট করে দেয় তা হলে তো সারা বছরের ধুমধাম এক দিনেই শেষ হয়ে যায়। সে হাত থেকে বলটা ফেলে দিল। এমন ভাব করল যেন সে বল নিয়ে বেলে মাছ ধরবার অভ্যেস করছে, শেষ পর্যন্ত মাছটা ফসকে গেল—আউট করা হল না। নেহরু আউট হয়ে গেলে এ খেলার আর থাকে কী?

উইলিয়ম গিলবার্ট গ্রেস, এক বুক দাড়ি, ইংলণ্ড-ক্রিকেটের 'দি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান'—ন বছর বয়েসে আরম্ভ করে ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত যে ক্রিকেট খেলেছে—সেবার এক ম্যাচে প্রথম বলেই আউট হয়ে গেল। বলটা—প্রথম বলটাই লাগল তার পায়ে, আর সারা মাঠ চেঁচিয়ে উঠল: হাউ। ওমা, আম্পায়ার যে বেমালুম আঙুল তুলে দিল। তার মানে, গ্রেস, তুমি আউট।

গ্রেস আম্পায়ারের কাছে এগিয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বললে, 'এটা কী হল? এত সব লোক, হাজার হাজার লোক কি তোমার আম্পায়ারিং দেখতে এসেছে, না, আমার খেলা দেখতে এসেছে? তাই মূর্খতা ছাড়ো, আমায় ব্যাট করতে দাও।'

ব্যারোও তেমনি বুঝল এত লোক টিকিট কেটে জড়ো হয়েছে

তার রান আউট করা দেখতে নয়, নেহরুর ব্যাট করা দেখতে।

কিন্তু নেহরু জানে বেল না খসলেও সে ক্ষেত্রে আউট, নীতিগত ভাবে আউট। আর এই নীতিবুদ্ধিটাই ক্রিকেট।

নেহরু ব্যারোর অসামর্থ্যকে অভিনন্দিত করলে না। বললে, আমি আউট। আর এইখানেই আমার ইনিংস শেষ।

সত্যিকার ক্রিকেটার না হলে এমন কথা কেউ বলে না।

পাপকে ঘৃণা করো কিন্তু পাপীকে নয়। সাম্রাজ্যবাদকে হটাও কিন্তু ইংরেজকে ভালোবাসো। প্রত্যেক মানুষকে ভালোবাসো।

তাই ক্রিকেটকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা হলে দেখতে হবে এ ক্রিকেট নয় এ যেন কেউ না বলে।

নাকে কাজ না নিশ্বাসে কাজ

'চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে।'

ওরে অমন ঠুক ঠুক করিসনে, ছুচারখানা মার ছ্যাখা, তপ্ত প্রাণ শীতল হোক। এক ঘণ্টা হয়ে গেল, বোর্ডে যে এখনো কুড়ি রানও উঠল না।

ব্যাটসম্যান টিঁকে থাকবার জন্যে বলের পর বল ব্লক করে যাচ্ছে, দর্শকদের অসহ্য লাগছে। তালে তালে তালি দিচ্ছে। তালি দিয়ে বোঝাচ্ছে তোমার এ হেন নিশ্চল পার্বত্য চরিত্র আমাদের পছন্দ নয়। একটা পাষাণবিদারী নির্ঝরের মত বেরিয়ে এস। উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে দিক-দেশ প্লাবিত করে দাও।

কালো মেঘের নিষেধ থেকে যেমন বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসে, শমী শাখার বক্ষ হতে যেমন বহ্নি বেরিয়ে আসে তেমনি, হে রান্, জড়ীভূত ব্যাটের কাষ্ঠস্তূপ থেকে তুমি নিরর্গল স্রোতে বিনির্গত হও।

ব্যাট বলছে, আমাকে অমনি নিষ্ক্রিয় করে রেখো না, আমাকে তোমার হাতের বীণা করে তুলে আমাকে কম্পিত শব্দিত ছন্দিত স্পন্দিত শিহরিত মুখরিত করে তোলো। যে বীণা তাকে শুধু একটা ঝাঁটা করে তুলো না। নীরব নির্বাক রেখে আমার জাত মেরে দিও না। আমাকে বাজাও আমার সমস্ত তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করো।

'বাজাও আমারে বাজাও। বাজালে সে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও।' কিংবা 'আমারে করো তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে। উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।'

বলেরও সেই প্রার্থনা। 'আরো আরো প্রভু, আরো আরো, এমনি করে আমায় মারো।' কিংবা 'লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা। মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।'

না, ব্যর্থ করব না, বলে ব্যাটসম্যান এক দিগন্তবিস্তীর্ণ সুইপ করতে গেল আর অমনি—ব্যস—

'কী, আউট হয়ে গেল?' আতঙ্কে শিউরে উঠল ইরা।

'শুধু আউট, একেবারে বোলড আউট। ঝাড়েবংশে লোপাট। লক স্টক য়্যাণ্ড ব্যারেল।'

'তখন ব্যারাকাররা কী বলে?'

'যদি স্বদেশের দর্শক হয় হায়-হায় করে।'

'কেন হায় হায় করবে?' রাজশ্রী ফোঁস করে উঠল: 'বলবে আপদ বিদায় হল! আমরা শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা দেখতে আসিনি। আমরা দেবাসুরে মিলে সমুদ্রমন্থন দেখতে এসেছি।'

চিত্রিতাও সায় করল : 'হ্যাঁ, আমরা ব্রাইটার ক্রিকেট চাই।'

'এ কী সব বাজেমার্কাদের টিমে নিয়েছে।' রাজশ্রীর রাগ যায় না: 'নাচতে জানে না, উঠোন চষে।'

'কিন্তু লাভটা হল কী?' ইরা শান্তস্বরে বললে, 'খ্যাপার মতন শুধু-শুধু একটা ঝাঁপ দিতে গিয়ে অকালে প্রাণ খোয়াল! বরং টিকে থাকলে লাভ ছিল। খুঁচখাঁচ করে দুচারখানা রান আসত। এ যে একেবারে সাফ হয়ে গেল।'

'তাই ভালো। মারো নয় মরো।' রাজশ্রী তড়পে উঠল।

'হ্যাঁ, কিংবা সারো নয় সরো।' চিত্রিতা সমর্থন করল: 'আমরা দর্শকেরা উত্তেজনা চাই। শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি আমাদের কাছে অসহ্য।'

'কিন্তু সবাই যদি অমনি তাড়াতাড়ি রান তোলবার তাগিদে তাগড়া মার মারবার ঝুঁকি নেয়, তা হলে তো ষোল আনা বিপদ।' আমি আরেক দিক থেকে বলতে চাইলাম।

'হোক বিপদ। খেলাটাই তো বিপদের খেলা।' রাজশ্রী আবার ঝলসে উঠল: 'আহত হবার বিপদ। শূন্য করার বিপদ। টিম থেকে বাদ পড়বার বিপদ।'

'সেই বিপদের সামনে কিছুটা ধৈর্য কিছুটা নির্বিচলতা প্রত্যাশা করব না? মনঃসংযোগের দাম দেবে না তুমি?'

'তাই বলে ডাল্ বিস্বাদ লাইফলেস নিষ্প্রাণ ক্রিকেট পরিবেশন করবে?' রাজশ্রীর সঙ্গে আবার সুর মেলাল চিত্রিতা: 'দর্শকদের জন্যেই তো ক্রিকেট। দর্শক যদি খেলা দেখতে না আসে তা হলে এমন সব শস্যশ্যামল মাঠ ছেড়ে ক্রিকেটকে মরুভূমিতে যেতে হবে। দর্শকের জন্যে উত্তেজনা চাই।'

'তাই বলে এলোপাথাড়ি মেরে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবে?' ইরা লক্ষ্মী মেয়ে, আমার পক্ষে এল। বললে, 'কখনো-কখনো শুধু টিঁকে থাকা, শুধু লেগে থাকাটাও একটা দারুণ উত্তেজনা। মনে নেই সেবার? শেষ ওভারটা কাটিয়ে দিতে পারলেই ড্র হয়, আর যদি উইকেটটা পড়ে যায়, তা হলেই হয়ে গেল। একেকটা বল করছে আর ওদিকে মারছে না, ধরছে না, এধারে ওধারে ছেড়ে দিচ্ছে, কখনো বা ব্লক করছে—সবাই ঘিরে ধরেছে লুফে নেবার জন্যে, তবু কিছু করতে পারছে না—মনে নেই? সে কী ভীষণ উত্তেজনা, প্রতি বলে হুল্লোড়, হাত-তালি—মনে নেই?'

কোন খেলাটার কথা বলছে স্পষ্ট না হলেও দৃশ্যটা অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না। বললাম, 'খুব মনে আছে। প্রতি বলের সঙ্গে সকলের প্রাণ ধুকপুক করছে আর গান গাইছে, তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী। কথাটা হচ্ছে এই, রজনী থাকতেই আমি আমার শয্যা ছাড়ি কেন? কিংবা, অন্য ভাবে বলি, প্রশ্নটা হচ্ছে, নাকে কাজ না নিশ্বাসে কাজ?'

'নিশ্বাসে কাজ।' ইরা বুকভরা আনন্দ নিয়ে বললে।

'মোটেই নয়।' হেসে উঠল রাজশ্রী: 'নাকটা থাকবে না, শুধু ছুটো ছ্যাঁদা থাকবে, কোনোরকমে ভস ভস করে নিশ্বাস পড়বে, অমন কদাকার হয়ে আমি বাঁচতে চাই না।'

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই।' ইরা প্রতিবাদ করল: 'শুধু নিশ্বাসটুকুর জন্যেই এত কাণ্ডকারখানা। তোর থ্যাঁদা নাকে কী করে তুই নৎ ঝোলাবি যদি তোর নিশ্বাসটুকুই না থাকে।'

'তাই বলে. ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে করে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? একটা স্ট্যাচুর যদি নিশ্বাসও পড়ে তা হলে কী আসে যায়!'

চিত্রিতা মেলাতে চাইল। বললে, 'আমাদের ছুইই চাই। নাকও চাই নিশ্বাসও চাই। রানও চাই টিকে থাকাও চাই। ফিকে হয়ে টিকে থাকার যেমন কোনো মানে নেই তেমনি মারতে গিয়ে চুরমার হয়ে যাওয়াও অনর্থক।'

'ওসব কিছু নয়।' সার কথা বলবার মত করে বললাম: 'সোবার্স যা বলেছে সেইটেই খাঁটি কথা।'

'কী বলেছে?' রাজশ্রী চোখ তুলল।

'বলেছে, আমি 'ব্রাইটার' ক্রিকেট বুঝি না, 'বেটার' ক্রিকেট বুঝি। তাই আমি 'ব্রাইটার' নয়, সব সময়েই 'বেটার' খেলতে চেষ্টা করব।'

'তার মানে কী দাঁড়াল?'

'মানে, যখন যেমন দরকার তখন তেমনি খেলব। দরকার বুঝলে পিটোব, দরকার বুঝলে ঠুকব। যে ব্রতের যে কথা, যে বিয়ের যে মন্ত্র। নরম পাই তো আঁচড়াব, গরম বুঝি তো সাবধান হব। টিমের স্বার্থে খেলা। যদি টিমের স্বার্থে টিকে থাকাটাই প্রশ্ন হয় তবে প্রাণপণে মাটি কামড়ে টিকে থাকবার চেষ্টা করব, আর যদি বুঝি, না, প্রাণ খুলে উদার স্থরে গান ধরতে হবে, জয়ের তীর দেখা যাচ্ছে, তা হলে হাত মেলে ব্যাট চালাব। যেমন কলি তেমন চলি। যখনকার যা তখনকার তা।'

'আমার মনে হয় এটাই ঠিক কথা।' ইরা বললে ভরাট গলায়।

'খানিকটা ঠিক।' বললাম, 'ফায়ারব্র্যাণ্ড ক্রিকেট খেলার দিন আর নেই, তেমন খেলতে তোমাকে দিচ্ছে কে? আজকাল নেগেটিভ বোলিংএব দিন, তোমাকে তাগড়া মার কে মারতে দেবে? আর সোবার্স বা কানহাই, ওনিল বা ডেক্সটারের মত য়্যাটাকিং ব্যাটসম্যান আর কজন?'

'নেগেটিভ বোলিং মানে?' রাজশ্রী বিরক্ত চোখে তাকাল।

'এ যুগটাই হচ্ছে সিম-বোলিং বা পেস-বোলিংএর যুগ, আর 'সিমার' থেকেই 'বিমাব'। যেখানে ওরকম বল সেখানে তোমাকে তো বাধ্য হয়েই ডিফেন্সিভ খেলতে হবে। আর তাবই জন্যে তো কনরাড হাণ্ট, বিল লরি, কেন ব্যারিংটন আর হানিফ মহম্মদের দরকার।'

'হানিফ মহম্মদ!' চিত্রিতা মুখে বিস্ময়েব চিত্র আঁকল।

'হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে লর্ডস মাঠে ১৯৫ মিনিটে অর্থাৎ সোয়া তিন ঘণ্টায় মোটে কুড়ি রান করলে। দেখাল কাকে বলে টিকে থাকা। কাকে বলে নিশ্ছিদ্র অভিনিবেশ। আর সেই হানিফই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বারবাডোসে ৩৩৭। সময়কালে ব্যাটকে বিষুবিয়স করা যদি গুণের কাজ হয় তেমনি সময়কালে ব্যাটকে বিন্ধ্যাচল করা গুণের কাজ হবে না কেন? ব্যাট কখনো আগুন ঝরাবে, কখনো বা পাথর ঠেকাবে। তাই ব্যাটসম্যান যদি প্লে-য়্যাট-সেফ বা কিপ-ইট-টাইট খেলে, মানে যদি সে স্লো খেলে, তাকে তুমি নিন্দে করতে পারো না, ব্যারাক করতে পারো না। সে বিশেষ অবস্থায় পড়ে, কখনো বা দলের স্বার্থেই, অমনি অটল-সুমেরু হয়ে থাকে। কখনো-কখনো শুধু টিকে থাকাটা, মানে, প্লেয়ার না হয়ে স্টেয়ার হয়ে থাকাটাও ক্রিকেট। নাকের চেয়েও নিশ্বাস দামী।'

'মানে কী জানো?' চোখে বুদ্ধির ঝিলিক দিয়ে ইরা বললে, 'আমরা শুধু ব্যাটিং দেখি, বোলিং দেখি না।'*

'কেন, মেডেন ওভারে আমরা হাততালি দিই না?' রাজশ্রী মুখিয়ে উঠল।

'সেটা একটা ম্যাটার অফ ফর্ম মাত্র। দিতে হয় দেওয়া, না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই।' ইরা বললে, 'সেটা এপ্রিসিয়েশান, এক্সজিলারেশাম নয়। মানে শুধু উষ্ণ সমর্থন, আনন্দের দাবানল নয়।'

'ঠিক বলেছে ইরা, আমরা শুধু ব্যাটিং দেখি, বোলিং দেখি না।' উৎসাহিত হয়ে উঠলাম: 'যত দোষ আমাদের, দর্শকদের। আর আমাদের মনোবঞ্জন করবাব জন্যেই যখন ক্রিকেট তখন কেবল ব্যাটিং-এর উপরেই জোর, ব্যাটিং-এরই যত জয়মাল্য। কিন্তু ব্যাট তুমি করবে কী করে যদি আমি নেগেটিভ বল দিই, যদি বডি-লাইন ছাড়ি? আর এ তো মেয়েদের পোশাকের বডি-লাইন নয়, এ দস্তুরমত ব্লাড়ি ল্াইন, বক্তরেখা। তাই ব্যারিংটন ঠিক বলে, যখন হিট না করে ঠুকি, শ্ল্যাস না করে বল ছেড়ে দিই, অর্থাৎ কিনা যখন বান কবতে পারি না, তখন আমাকে গালাগাল না দিয়ে বোলারকে গালাগাল দিতে পাবো না? বলতে পারো না, ওবে বোলার, স্লো বল দে, লোফা বল দে, গুড লেংথে না দিয়ে শর্ট পিচে সফট দে, আমাদের কেন্ বা কেন্নু দু-চারখানা চার মারুক, একটা ছয় তুলুক আকাশে। কই তা তো বলো না। রান যে ওঠে না তার জন্যে তো বোলারও দায়ী। তারই ঐ সব কঠিন হৃদয়হীন বলের জন্যে কেউ তো তাকে দোষে না, যত অভিশাপ ব্যাটসম্যানকে। তাই ব্রাইটার ক্রিকেট দেখতে চাও, সফটার বোলার বা কোমলকরুণ দানশীল বোলার আমদানি করো। চোরকে বলবে চুরি করো কিন্তু গৃহস্থকে সাবধান হতে বলবে না, বরং বলবে উদার হাতে দরজা জানলা খুলে দাও, তোমার সর্বস্বধন পরমায়ু লুণ্ঠন করে নিক, এ ঘোরতর অন্যায়।'

'কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে।' চিত্রিতা স্বচ্ছ মুখে বললে, 'সত্যিই তো, আমরা শুধু ব্যাটিং দেখি বোলিং দেখি না। কেউ সেঞ্চুরি করলে তার নামটাই খবরের কাগজের হেড লাইন হয়, যত বড়ই কৃতিত্ব দেখাক বোলারের নামটা শেষে থাকে।'

'ঠিক।' ইরা আরো জোর পেল। বললে, 'আমাদের দর্শনেই ভুল। বিপরীতটা না দেখলে দর্শন পরিপূর্ণ হয় না।'

'খাঁটি কথা। শুধু ব্যাটসম্যান দেখি। হানিফের ৩৩৭-ই দেখি, সেটা করতে যে ১৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট লেগেছিল তার খোঁজ নিই নে। তার মানে ঘণ্টায় ২১ রান। এটাকে ব্রাইট ক্রিকেট বলবে না, ব্রাইট খেলতে গেলেই অকালে অস্ত যেতে হত, সেটা কোনো কাজের হত না। ঠুকঠুকিয়ে টিকে ছিল বলেই তো ঐ শীর্ষেন্দু! প্রশ্নটা হচ্ছে, আধ ঘণ্টায় কুড়ি রান করে আউট হওয়া ভালো, না, এক ঘণ্টায় তিরিশ রান করে আউট না হওয়া ভালো? রানীর কী মত?' রাজশ্রীর দিকে তাকালাম।

ইরার অমনি লাগল। বললে, 'রাজশ্রী বুঝি রানী?'

'রাজশ্রী রানীর চেয়েও বেশি।' রাজশ্রী খুশিতে ডগমগ হয়ে বললে, 'রাজ্যশ্রী হলে রানী হত। রাজশ্রী মানে শ্রীশ্রেষ্ঠা—অর্থাৎ দেবী।'

'তিলোত্তমা।' ইরা ভেংচি কাটল।

বললাম, 'ইট ইজ নট ক্রিকেট।'

'নয়ই তো।' রাজশ্রী চনমন করে উঠল: 'আমার মতে ছাদে টালি হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মাটিতে হীরে হয়ে ভেঙে যাওয়া ভালো।'

'তা হলে প্রথম বলে একটা চার মেরে দ্বিতীয় বলে আরেকটা চার মেরে তৃতীয় বলে বোল্ড হয়ে যাওয়া ভালো? আহা, কী রান-রেট, পাঁচ মিনিটে আট রান, ঘণ্টায় ছিয়ানব্বুই রান!' ইরা ঠাট্টা করে উঠল: 'একখানা ওয়ার্লড রেকর্ড, বিশ্বশ্রী।'

'না, টিকে থাকাটাই মুখ্য, রান গৌণ।' বললাম, 'আউট হয়ে গেলে আর রান নেই, টিকে থাকলেই আশা আছে। আর এই টিকে থাকাটাই কী রকম রোমাঞ্চকর হতে পারে তোমাদের বলি। উনিশ শো তিপ্পান্ন সালের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে লর্ডস মাঠে। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ড তিন উইকেটে বারো রান—হাটন, কেনিয়ন আর গ্রেভনি যথাক্রমে ৫, ২ আর ২। কম্পটনের সঙ্গে যুক্ত হল ওয়াটসন, কিন্তু কম্পটন ৩৩ করে এল-বি হয়ে গেল। নামল বেইলি, যার আরেক নাম টিকনদার, অর্থাৎ যে শুধু টিকে থাকে, ইংরিজিতে বললে স্টে-পুট। তার ক্যাপ্টেন, হাটন তাকে কী বলে দিল? বলে দিল, বাইটো ট্রেভর, স্টপ দি রট। পচন বন্ধ করো, মৃত্যুস্রোত ঠেকাও। কখনো কখনো ক্যাপ্টেনের আদেশেই যে স্লো খেলতে হয় তার খবর কে জানে? ব্যাটসম্যানকে স্লো খেলবার জন্যে গালাগাল দিচ্ছে কিন্তু সে যে রামের আদেশে ধরো-লক্ষ্মণ হয়ে আছে, এ বোঝে কে?'

'হ্যাঁ, বেইলি কী করল?' চিত্রিতা আস্তে সুতোটা ধরিয়ে দিল।

'একটা দম-দেওয়া যান্ত্রিক পুতুলের মত ঠুকঠুক করতে লাগল। দমও ফুরোয় না, পুতুলও হাত-পা মেলে না। অনন্ত ধৈর্যের তপস্যায় একটা প্রকাণ্ড উইয়ের ঢিপি হয়ে রইল। টিকে থেকে-থেকে পার করে দিল ইংল্যাণ্ডকে। কোনো গালাগালেই সে বিভ্রান্ত হল না—তার ক্যাপ্টেনের আদেশ, তার দেশের ইজ্জত।'

'করল কত?' রাজশ্রী ফোঁস করে উঠল।

'একাত্তর। প্রায় পাঁচ ঘণ্টায়। কিন্তু এটাই তার টেস্টে স্লো রানের রেকর্ড নয়।'

'ঘণ্টায় চৌদ্দ রান—এটাও তার রেকর্ড নয়?' চিত্রিতা চমকে উঠল।

'না। সেই বছরেই লীডস টেস্টে তার রান হচ্ছে ২৬০ মিনিটে

৩৮, তার মানে ঘণ্টায় ৯ রানেরও কম। কিন্তু এহো বাহ্য, আরো আছে।'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ, ১৯৫৮-৫৯-এ ব্রিসবেনে ৪৫৮ মিনিটে ৬৮, তার মানে ঘণ্টায় সেই ৯ রানের কাছাকাছি। কী অপূর্ব রেকর্ড! কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে। যে হ্যারিকেন-হিটিং করে খেলে সে নিজের জন্যে খেলে, নিজের মোক্ষের জন্যে, আর যে স্লো খেলে সে দলের জন্যে খেলে, মানে, জগতের হিতের জন্যে খেলে। দলের জন্যে যে খেলে সেই আসল খেলোয়াড়।'

'কিন্তু যে 'আত্মনাং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' খেলে সেই আসল সন্ন্যাসী।' রাজশ্রী রানীর মতই বললে, 'অর্থাৎ নিজেও দ্রুত রান করে সেঞ্চুরি করো আবার সময় সঞ্চয় করে টিমকেও জেতাও।'

'কিন্তু তেমন সন্ন্যাসী কোথায়? সে ছিল ব্র্যাডম্যান, একদিনেই একা ৩০৯ রান। সে ছিল হ্যামণ্ড, এক দিনেই একা ২৯৫ বান। সে ছিল কম্পটন, এক দিনেই একা ২৭১। ফাস্টেস্ট ডবল সেঞ্চুরিতেও সেই কম্পটন আর হ্যামণ্ড—'

'কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছিল চঞ্চলদের নিয়ে নয়, মন্থবদের নিয়ে—' চিত্রিতা মনে করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ার হ্যাসেট কী করল শোনো। ওয়ারউইক-শায়ারের সঙ্গে খেলা হচ্ছে, ১৯৫৩-তে। অস্ট্রেলিয়া ১৫০ করলেই জিতে যায়, আর ওদের পক্ষে ১৫০ কবা নস্যি। কিন্তু কী হল? বোলার হোলিস সব ছত্রখান করে দিল। এমন অবস্থায় এনে ফেলল, সবাই ভাবল অস্ট্রেলিয়া হেরে যাবে। সে কী উত্তেজনা! নামল হ্যাসেট, তিন ঘণ্টা সময় এখনও বাকি, দুর্দান্ত হোলিসকে কী করে সামলাবে? ক্ষুধার্ত শকুনের মত ফিল্ডসম্যানরা ঘিরে ধরেছে হ্যাসেটকে, ভিজে মাঠে হোলিস ছাড়ছে তার লেগ-ব্রেক। একের পর এক বল ছেড়ে দিচ্ছে হ্যাসেট, যদি কখনো বা ঠুকছে, প্রসারিত

বাঘের থাবাগুলো কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না। ভাবতে পারো তিন-তিন ঘণ্টা ধরে এই কসরৎ করছে হ্যাসেট? সে জানে সে যদি আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া শেষ হয়ে যাবে, তার পরে এমন কেউ নেই যে ঝ্যাপা সামলায়। সমস্ত দায়িত্ব এখন তারই কাঁধে। সে কি এখন রান তোলবার বা ব্রাইট খেলবার ঝুঁকি নিতে পারে? পারে না। দর্শকের দল স্লো-হ্যাণ্ড ক্ল্যাপ দিয়ে ব্যারাক করছে, হ্যাসেটের ভ্রূক্ষেপ নেই, বু করছে, গালাগাল দিচ্ছে, তবু এক চুল নঁড়ছে না হ্যাসেট। ভাবতে পারো একটা কাউন্টির কাছে হেরে যাবে এই অসাধারণ উত্তেজনা থেকে দর্শকদের হ্যাসেট বঞ্চিত করছে, তার সেই অপরাধ তারা মার্জনা করবে কী করে? মেরে বসিয়ে দাও, মাথা ফাটিয়ে দাও, ঘাড় ধরে বার করে দাও মাঠ থেকে—কিন্তু হ্যাসেটের এতটুকু ধিক্কার নেই, চল-বিচল নেই, শত বিরুদ্ধতাতেও সে বিধ্বস্ত হচ্ছে না। পায়ে একটা বল লাগলেই দর্শকদের সে কী হুহুঙ্কার—হাউজ্যাট? আম্পায়ার 'না' করে দিলে পর আম্পায়ার-দের উপর তম্বি—'

'অথচ বোলারকে কেউ গাল দিচ্ছে না—সে যে মারবার জন্যে বল দিচ্ছে না তার জন্যে তাকে বু করা নেই।' ইরা বললে, 'যত দুয়ো ব্যাটসম্যানকে।'

'অথচ হ্যাসেটের ঐ দৃঢ়তা ঐ তন্ময়তাকে কী ভীষণ প্রশংসা করা উচিত।' বললে চিত্রিতা।

'কিন্তু দর্শকমাত্রই পক্ষপাতদুষ্ট। তারা বিপরীতটা দেখতে পারে না, দেখতে চায়ও না। তারা চায় হ্যাসেটের আউট হয়ে যাওয়া। হ্যাসেট প্রলুব্ধ হয়ে ভুল করুক তারা এই চায়, হ্যাসেট প্রলুব্ধ হয়েও যে বিভ্রান্ত হচ্ছে না এই মহৎ গুণকে তারা সংবর্ধনা করে না। দর্শক-মাত্রই ক্ষুদ্র, কৃপণ, একচক্ষু। অথচ এদের রোমাঞ্চিত করবার জন্যেই নাকি ক্রিকেট। হ্যাসেটের এই কীর্তি কি কম রোমাঞ্চকর?'
'করল কত হ্যাসেট?' রাজশ্রী রুখে উঠল।

'তিন ঘণ্টায় কুড়ি রান।'

'কী সর্বনাশ! আউট হল?'

'না। অস্ট্রেলিয়াকে বাঁচিয়ে দিল। ওয়ারউইকশায়ারকে জিততে দিল না। তাই হ্যাসেট যখন খেলার শেষে গাড়িতে উঠছে হোটেলে ফিরে যাবার জন্যে, তখনো দর্শকের দল তাকে দুয়ো দিচ্ছে! আহা, তার বড় অপরাধ, সে স্লো খেলেছে, স্লো খেলে বাঁচিয়েছে তার দেশকে। তার বড় অপরাধ হোলিসকে নির্বিষ করে দিয়েছে, প্রসারিত ছ জোড়া হাতের মধ্যে একটা তপ্ত ক্যাচ উপহার দেয় নি। ইংল্যাণ্ডের দর্শক যখন, সে হ্যাসেটের কোনো য়্যাসেট দেখতেই প্রস্তুত নয়। ইট ইজ নট ক্রিকেট।' উঠলাম চেয়ার ছেড়ে, ইরার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি ওটা একটা খুব দামী কথা বলেছ, বিপরীতকে দেখা। শুধু ব্যাটসম্যানকেই দেখা নয়, বোলারকেও দেখা। শুধু আবার হোলিসকেই দেখা নয়, হ্যাসেটকেও দেখা। আমি যেমন,' ইরার টলটলে দুটি তরল তারকার দিকে তাকালাম: 'তোমার মধ্যে তোমার বিপরীতকে দেখি।'

'আমার বিপরীত!' ইরা ঘাবড়ে গেল।

'তোমার নামের বিপরীত।'

'সে আবার কী?'

'তোমার নামটা উল্টোলে কী হয়? তোমার নামটা উল্টোলে রাই হয়। তোমার মাঝে রাইকে দেখি।'

'আহা, কী দর্শন।' রাজশ্রী ঠোঁট উলটোলো।

'হা রাই বলে কাঁদতে গেলেই আর রাই নেই, হারিয়ে ফেলেছেন।' বললে চিত্রিতা।

'আমি তো কোনো চান্স নেব না,' হাসলাম: 'তাই আমার আবার হারাবার ভয় কী। আমি শুধু টিকে থাকব। আমার তো নাকে কাজ নেই, আমার নিশ্বাসে কাজ।'

রাজশ্রীও হাসল।

করিষ্যে বচনং তব

'আউট ?' ব্যাটসম্যান উদ্ধতের মত এগুলো আম্পায়ারের দিকে।

'আমার তর্জনী যখন বলছে আউট, তখন আউট বৈ কি।' আম্পায়ার বললে।

'আপনি নিশ্চিত ?'

'সেটা খবরের কাগজেই দেখতে পাবে।'

ব্যাটসম্যান ফিরে চলল প্যাভিলিয়নে।

অর্থাৎ আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই তোমার করবার নেই। প্রতিবাদ দূরের কথা, সামান্য ভাবে-ভঙ্গিতে যে অসন্তোষ প্রকাশ করবে তারও অধিকার নেই। করতে গেলে অ-ক্রিকেট হয়ে যাবে। আম্পায়ার যদি ভুলও করে, তুমি তাই মেনে নিতে বাধ্য। সেই নীরব প্রতিশ্রুতি দিয়েই তুমি খেলায় নেমেছ। এখন আর তোমার অন্য আচরণ সাজে না। আর যাই হোক, তোমাকে ভদ্র-লোক হতে হবে তো!

'করিষ্যে বচনং তব।' অর্জুনকে গীতায় তাই মানতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ যা বলেছ তাই করব। তার মানে, যুদ্ধটা করব, ফল যাই হোক। তার মানেই বাধ্যতা, বশ্যতা, নতির নীতি-জ্ঞান। এক কথায় ডিসিপ্লিন।

কিন্তু একবার কেন্ ম্যাকে তেড়ে গেল আম্পায়ারকে। বল করছিল ম্যাকে, ব্যাটসম্যানের পায়ে গিয়ে বল লাগতেই ম্যাকে এল-বি আশা করে 'হাউ' করে উঠল। আবেদন অগ্রাহ্য করল আম্পায়ার, তর্জনী দূরের কথা, কনিষ্ঠ আঙুলটিও নাড়ল না।

'এটার মানে কী?' ম্যাকে মুখিয়ে উঠল: 'বলটা কি তবে পায়ে না লেগে স্ট্যাম্পে গিয়ে লাগলে তুমি আউট দেবে?'

আম্পায়ারও ঝান্নু। স্পষ্ট বললে, 'না, তা হলেও না। কেননা তোমার বলে বেল খসবে না।'

কিন্তু লারউড়ের ব্যবহার আরো দুর্দান্ত ছিল। অস্ট্রেলিয়ার রন্ অক্সেনহ্যাম-এর বিরুদ্ধে বল করছে। একটা বলে অক্সেনহ্যাম শর্ট লেগের দিকে ক্যাচ তুলে দিয়েছে, টুপ করে লুফে নিয়েছে ফিল্ডস-ম্যান। বোলিং মার্ক থেকে স্টার্ট নিতে ঘুরে দাঁড়াতেই লারউড দেখল, এ কী, অক্সেনহ্যাম ক্রিজে দাঁড়িয়ে আছে—আউট হয় নি! হাউ! আউট নয়? আম্পায়ারকে জিজ্ঞেস করল লারউড। আম্পায়ার বললে, বল ব্যাটে লেগেছে না প্যাডে লেগেছে দেখিনি। দেখনি? না, বল করে ছুটে তুমি মাঝখানে এসে পড়াতে দেখতে পাইনি। তোমার শরীরই আমার দৃষ্টিপথে বাধা হল। বটে? তুমি—তুমি দেখনি? স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের কাছে আবেদন করল লারউড। সে বললে, ও আমার দেখবার কথা নয়। লারউড আস্তিন গুটোল। সে কথা হচ্ছে না, দেখেছ কিনা তাই বলো। না, দেখিনি। স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার মাথা চুলকোল: আমি অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

দেখ নি, কেউ দেখ নি, কিন্তু তুমি আক্সেনহ্যাম, তুমি তো দেখেছ, তোমার বিবেক তো দেখেছে বল তোমার ব্যাট ছুঁয়ে গেছে—তবে তুমি প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাচ্ছ না কেন?

কেন যাব? তোমার কথায়? তুমি কে?

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। বাপ-বাপ বলে যাবে। তখন মনে হবে, আগে গেলেই ভালো করতাম। সত্য ও মাথা দুই-ই বাঁচত।

পর-পর তিনটে বাম্পার ছুঁড়ল লারউড। শেষেরটা অক্সেন-হ্যামের ঠিক মুখের উপর।

ব্যারাকিং তো সামান্য কথা, পারলে জনতা লারউডকে গুলি

করে মারে। লারউড ফিরে তাকাল: আর, তুমি জনতা, তুমি তখন কোথায় ছিলে যখন অক্সেনহ্যাম আউট হয়েছে জেনেও প্যাভিলিয়নে ফিরে গেল না, মাটি কামড়ে পড়ে রইল? তখন কোথায় ছিল তোমার রণোন্মাদ হুহুঙ্কার?

বা, আম্পায়ার আউট না দিলে করবে কী?

তেমনি আম্পায়ার আমার বলকেও নো-বল বলে নি। অতএব আমি আম্পায়ারের সমর্থনে বাম্পার ছুঁড়েছি। তার মানে, অক্সেনহ্যামের বিবেকের দংশনটা শুধু মুখের উপর লেখা হল।

এখন কথা এই, কে প্রবলতর হবে—খেলোয়াড় না আম্পায়ার? প্রশ্নটা এই ভাবে উঠলে উত্তরে বিন্দুমাত্র কুয়াশা থাকে না—আম্পায়ারই প্রবলতর হবে। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এই ভাবে আসে যে কে বলবত্তর হবে, বিবেক না বিচারক, তখন উত্তরে দ্বিধা আসে বৈ কি। আমি জানছি আমি আউট, তবু আম্পায়ার আউট দিচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে, আমি যদি সত্যিকার স্পোর্টসম্যান হই, আমার তো বিবেকের আদেশ মেনে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়া উচিত। নইলে সত্যের জয় সত্যের মান প্রতিষ্ঠিত হল কী করে?

না, এক দল বলছে, সে ক্ষেত্রে, শুধু সে ক্ষেত্রেই নয় সর্বক্ষেত্রেই আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য। তুমি যখন জানছ তুমি আউট, তোমার সে জানাটাও ভুল হতে পারে, সুতরাং আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করো। সে যদি বলে নট-আউট, তুমি নট-আউট। তার উপরে কোনো কথা নেই, কারো কথা নেই। সর্বাবস্থায় নির্বিবাদে তার কথা মানবে, মনে রেখো, এই তোমার খেলতে নামার প্রথম সর্ত।

নইলে, ধরো, তোমার বিবেক বলছে তুমি লেগ-বিফোর বা ক্যাচ-বিহাইণ্ড হও নি অথচ আম্পায়ার তোমাকে আউট দিয়েছে, তুমি কী করবে? বড়জোর তুমি হতভম্বের ভাব দেখিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, ব্যাটটা বার কতক মাটিতে ঠুকে ইঙ্গিত

করতে পারো এটা ক্যাচ নয় 'বাম্প', মোটমাট বোঝাতে পারো আম্পায়ারের বিচারে তুমি সন্তুষ্ট হও নি—কিন্তু সাধ্য নেই সেই বিচার অগ্রাহ্য করে তুমি পরের বলে ব্যাট চালাও, তোমাকে ফিরে যেতেই হবে প্যাভিলিয়নে। আম্পায়ারের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল নেই। চূড়ান্ত আদালতের রায় যতই অমনোনেয় হোক, তা অনমনীয়, তা সমর্পণের ভঙ্গিতে মেনে চলতেই হবে। আউটের বেলায় যদি মানো, নট-আউটের বেলায় মানবে না কেন? আম্পায়ার আউট বলছে না অথচ তুমি তোমার বুদ্ধিতে নিজেকে আউট বিবেচনা করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছ—এটা কোন দিশি বাহাদুরি? এটা তো দস্তুরমত 'কণ্টেম্পট'। তোমার কোনো অধিকার নেই আম্পায়ারকে তুমি উপহাসাস্পদ করো। এটা যেন প্রকারান্তরে বলা, তুমি, আম্পায়ার, তুমি মূর্খ, তোমার চেয়ে আমি বেশি বুঝি। আম্পায়ার নিয়ে খেলতে নেমে এ ইঙ্গিত করা শুধু অশোভন নয়, এ অন্যায়।

এমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল সাউথ আফ্রিকায়, গত টেস্টে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। সাউথ আফ্রিকার এডি বার্লো ব্যাট করছে, হঠাৎ সমস্বরে সমগ্র ইংল্যাণ্ড গর্জন করে উঠল: হাউ! আম্পায়ার সবিনয়ে জানাল নট-আউট।

দারুণ ক্ষুণ্ণ, ক্রুদ্ধ হল ইংল্যাণ্ড। ক্ষোভে একটা কাণ্ড করে বসল। বার্লো যখন সেঞ্চুরি করল তখন তারা তাকে বিন্দুমাত্র অভিনন্দন জানাল না। সামান্য একটা প্রশংসাসূচক ভঙ্গি পর্যন্ত করল না। অর্থাৎ, এমন ভাব দেখাল, চুরি করে যে সেঞ্চুরি করে তাকে আমরা বাহবা দিই না।

কিন্তু এই কি ক্রিকেট, এই কি খেলোয়াড়ি মনোভাব? বার্লোর দোষ কী! আম্পায়ার তাকে আউট না বললে সে ব্যাট ছাড়ে কী করে? আম্পায়ারের বিরুদ্ধাচারণ করাটাই কি সমীচীন হত?

ইংল্যাণ্ডের ইনিংসে ব্যারিংটন বিপরীত কাণ্ড করে বসল।

হাউ! চেঁচিয়ে উঠল সাউথ আফ্রিকা। আম্পায়ার নট-আউট বললে। ব্যারিংটন তা মানল না। নিজেই নিজেকে আউট দিয়ে চলে গেল মাঠ ছেড়ে।

কেউ-কেউ ব্যারিংটনকে প্রশংসা করল, কেউ-কেউ করল না। শেষের দলই বেশি ভারী। আম্পায়ারের প্রভুত্বই যদি অগ্রাহ্য করবে তবে খেলায় আম্পায়ার রেখেছ কেন? খেলোয়াড়রা নিজেদের ইচ্ছে মত যাওয়া-আসা সুরু করলেই পারে। কোনো শাসন নেই শৃঙ্খলা নেই নীতিজ্ঞান নেই, ইচ্ছেমত আউট ইচ্ছেমত নট-আউট। 'দুনিয়াদারি মুসাফিরি সেরেফ আনা যানা।' তা হলে কি খেলা চলে?

খেলার জন্যই যখন আম্পায়ার, তখন খেলাব খাতিরেই তার নির্দেশ মানতে হবে, সে তোমাব মনঃপূত হোক বা না হোক। আম্পায়ারের চেয়ে আমি বেশি বুঝি এমন একটা দুর্বিনীত ইঙ্গিত করাও যায় না। তাছাড়া তুমি, ব্যাটসম্যান, তুমি যে ভুল করছ না তাব নিশ্চয়তা কী! হয়তো তুমি ভুল করেই নিজেকে আউট ভাবছ। হয়তো আম্পায়ারের নট-আউট সিদ্ধান্তটাই ঠিক ছিল।

কিন্তু ধরুন, আমি যদি সত্যি-সত্যিই পরিষ্কার বুঝে থাকি উইকেট-কিপারের দস্তানার মধ্যে পড়বার আগে বল আমার ব্যাট ছুঁয়েছিল অথচ আম্পায়াব দেখতে না পেয়ে বা ভুল করে আমাকে নট-আউট দিলে, আমি তখন কী করব? জিজ্ঞেস করছে ব্যারিংটন। আউট জেনেও আমি খেলে যাব? যদি খেলে যাই, তারপর যা রান করব তাতে কি স্বাদ থাকবে, আনন্দ থাকবে? একটা ছয়ের মারকে কি আব তখন রোমাঞ্চময় মনে হবে? মনে হবে আমি অপরাধী, আমি চোরাই মালের কারবার করছি। পরের রানগুলিতে আমার কোনো স্বত্ব নেই। এই অবস্থায় আমাকে কী করতে বলেন?

বলি, আম্পায়ারকে বলে রিটায়ার করে চলে যাও। কেউ

আহত হয়ে অবসর নেয়, তুমি অনাহত অবস্থায় অবসর নিলে। তুমি খেলব না বললে কে কী করতে পারে? শুধু আম্পায়ারকে বলে, জানিয়ে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও। তার কর্তৃত্বকে অতিক্রম করে ঔদ্ধত্যের ধ্বজা তুলে বীরদর্পে হেঁটে যেও না। তাকে মাঠের মধ্যে বাঁদর বানিয়ে চলে যাওয়াটা ক্রিকেট নয়।

আরো কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে আম্পায়ারকে। শুধু মুখের মন্তব্য নয়, কাগজে-কলমে গালাগাল নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গুরুতর, দস্তুরমত ঢিল, থান ইট, বিয়ারের বোতল। ১৯৫৩-৫৪তে আম্পায়ার মেঞ্জিসের কী দশা হয়েছিল? ১৯৫৯-৬০এ লয়েডের? আর ১৯৫৪তে স্যাং হিউর?

১৯৫৩-৫৪তে জর্জটাউনে টেস্ট খেলা হচ্ছে ইংল্যাণ্ড আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। ইংল্যাণ্ড ফার্স্ট ইনিংসে ৪৩৫ করেছে, তার মধ্যে হাটনই একা ১৬৯। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অবস্থা শোচনীয়, ৭ উইকেট হারিয়ে মোটে ১৩৯। উইকেট-কিপার ম্যাকওয়াট আর হোল্ট খেলছে। আস্তে আস্তে দুশোতে তুলেছে স্কোর, দুর্ধর্ষ স্ট্যাথাম কিছু করতে পারছে না, লক, লেকার ও ওয়ার্ডল্‌ও নিষ্প্রভ। ম্যাকওয়াট যখন ব্যক্তিগত পঞ্চাশ রাণ পূর্ণ করল তখন জনতার কী উল্লম্ফন! ৭ উইকেটে মোট রান তখন ২৩৫। চতুর্দিকে তপ্ত উত্তেজনা, আর দুরান হলে এদের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ হয়। ম্যাকওয়াট থার্ড ম্যান পিটার মে-র কাছে একটা বল কাট্ করে পাঠিয়েছে—সবাই আশা করল, এই মারে সহজেই দুটো রান হয়ে যাবে। এক রান নিয়ে দ্বিতীয় রান নেবার মুখে মে ছুটন্ত বলটা কুড়িয়ে নিয়ে চক্ষের পলকে ইভান্সের হাতে নিখুঁত ছুঁড়ে দিল। চক্ষের পলকে ইভান্স বেল ভূমিসাৎ করে দিল। আর চক্ষের পলকে মেঞ্জিসের তর্জনী উঠে গেল উপরে।

আর যায় কোথা! নিদারুণ আশাভঙ্গে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেঞ্জিসকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে বোতল ছুঁড়তে

লাগল। বোতলের পর বোতল। মেঞ্জিস একবার ভাবল ছুটে পালাই, কিন্তু কোন দিকে ছুটবে, সব দিকেই বোতলমুখো জনতা! যাকে সবাই মান্য করবে তারই উপর কিনা এই বর্বরতা! যাকে বলে কিনা, মান্য করলে কল্পতরু, না হলে দামড়া গরু।

মেঞ্জিসকে আটকাল হান্টন। না, পালানো চলবে না, খেলা চালিয়ে যান।

কিন্তু জনতার মেজাজ ফিরিয়ে আনা যায় কী করে?

রামাধীন যখন নামল, নয় নম্বরের ব্যাটসম্যান, তখনও মাঠে বোতল পড়ছে। তখন ওয়ার্ডল এক মজা করল। একটা বোতল কুড়িয়ে নিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হবার অভিনয়ে টলতে লাগল, নাচতে লাগল। প্রায় সার্কাসের ক্লাউনের মত। তার কাণ্ডকারখানা দেখে জনতা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল। ফিরে এল খোসমেজাজের হাওয়া।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ! মাত্র দু রান করে লেকারের বলে আউট হয়ে গেল রামাধীন।

আবার সুরু হল বোতলবৃষ্টি।

রামাধীন যদি সরাসরি বোল্ড আউট হয়ে যায় তাহলে মেঞ্জিস কী করবে? বোল্ড আউটে তো একটা হাউ বলবারও অবকাশ নেই।

তা বুঝি না। তুমি ম্যাকওয়াটকে রান আউট দিয়েছিলে কেন?

শুধু ফুট-পুলিশে হল না, মাউন্টেড পুলিশ এসে বাঁচাল মেঞ্জিসকে।

১৯৫৯-৬০এ টেস্ট খেলা হচ্ছে পোর্ট অফ স্পেনে। হান্টের একটা ক্যাচ ট্রুম্যান বাঁ হাতে লুফে নিয়েছে। হান্ট দাঁড়িয়ে আছে, ভাবখানা, বল মাটি থেকে লাফিয়ে উঠেছে, ব্যাট ছোঁয়নি। কিন্তু আম্পায়ার লয়েড তা মানলে না। আউট দিলে। ক্যারিবিয়ান জনতা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। শীতের পাতার মত যত ঝরতে লাগল উইকেট, জনতার মাথার চুল ততই খাড়া

হতে লাগল। আট উইকেটে চরণ সিং যখন শূন্য করে রান আউট হয়ে গেল—হায়, টেস্টে চরণ সিংএর সেই প্রথম চরণ—জনতা আগুন হয়ে উঠল, মারো লয়েডকে। বোতলের পর বোতল পড়তে লাগল মাঠে। ট্রানজিস্টারে কারা শুনলে কমেণ্টেটাররা জনতাকে গুণ্ডা বলেছে। সুতরাং কমেণ্টেটারদের দিকেও বোতল পাঠাও। কিছু বোঝে না, দূরে বসে শুধু ফবফর করে!

সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। সশস্ত্র পুলিশ এল, এল বিরাট ফায়ার এঞ্জিন। বিশাল পাইপ দিয়ে জনতার উপর জল ঢালতে লাগল।

বোতলও এল জলও এল, শুধু আসল বস্তুই নেই। সেই আসল বস্তুর নামই আনুগত্য, যার অনুবাদই ক্রিকেট।

১৯৫৪-এর টেস্টে, অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, আম্পায়াব স্যাং হিউর অপবাধ সোবার্সকে ফিলপটেব বলে সিম্পসনের হাতে ক্যাচ-আউট দিয়েছে, আব গ্রিফিথকে নো-বল করেছে! অন্যায়, অন্যায়! কাজী যদি পাজি হয়, পাজিদেরই তাহলে কাজী হওয়া উচিত।

আবার সেই বোতলবর্ষণ। আবার সেই হুলুস্থুল।

চল্লিশজন কনস্টেবল এসে স্যাং হিউকে ঘেরাও করে ঘরে নিয়ে চলল।

কিন্তু পাকিস্তানের আম্পায়ার ইদ্রিস বেগ-এব বেলায় কী হল? এমসিসি-র খেলোয়াড়রা তার মাথায় ঘোল না ঢেলে জল ঢালল।

পেশোয়ারে টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে যা অবস্থা তাতে আর আট রান হলেই পাকিস্তান জেতে, আর তখনো তার হাতে আটটা উইকেট মজুত। রাত্রে হোটেলে ডিনার খাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা, রেডিওতে শুনতে পেল পাকিস্তানী বক্তারা তাদের টিমের আকাশচুম্বী প্রশংসা করছে। বলছে এমন একটা জয় জগতের ইতিহাসে দুর্লভ।

ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা রুষ্ট হল। এখনো খেলা শেষ হয়নি, এরই মধ্যে জয়-জয়কার! ধরা যাক, জিতবেই হয়তো শেষ পর্যন্ত, তবু আগে থাকতেই জয়ের গৌরব করা একটু বাড়াবাড়ি নয়? দাঁড়াও, মজা করি। আম্পায়ার ইদ্রিস বেগকে তার হোটেল থেকে ধরে নিয়ে আসি। সেই তো আমাদের অধঃপাতের কারণ। আমাদের কত আর্জি আপিল ও নস্যাৎ করে দিয়েছে। নইলে পাকিস্তানের রাশীভূত রান হয়? চলো ইদ্রিস বেগকে ঠাণ্ডা করি।

টাঙায় করে কতগুলো ইংরেজী খেলোয়াড় বেরিয়ে পড়ল। ভাঁওতা দিয়ে ইদ্রিস বেগকে তার হোটেল থেকে বার করে আনল। চলো বেড়িয়ে আসি, রাতের পেশোয়ার দেখি। ইদ্রিস টোপ গিলল। তাকে নিয়ে আসা হল ইংরেজদের হোটেলে। এই চেয়ারটাতে বোসো, এক পাত্র সুরা পান করো।

তোবা! ইদ্রিস মদ খেতে অসম্মত হল। সবিনয়ে বললে, বরং সাদা জল দাও।

আমরাও তাই ভেবেছিলাম, জলের বেশি তোমার কিছু প্রাপ্য নেই। বলতে-বলতে তুজন ইংরেজ খেলোয়াড় ইদ্রিসের মাথায় তু ড্রাম জল ঢেলে দিল। বললে, সাদা অকৃত্রিম জল। এবং কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা!

ইদ্রিস তো স্তম্ভিত!

আশা করি এবার থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আম্পায়ারি করতে পারবে। পক্ষপাতিত্ব করবে না।

মাঠের বাইরে হলেও ইংরেজ খেলোয়াড়দের এ আচরণ অমানুষিক।

এ ব্যাপারের জল অনেক দূর গড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সুরাহা হল যখন এমসিসি-র ম্যানেজার হাওয়ার্ড ইদ্রিস বেগের কাছে ক্ষমা চাইলে।

যেমন পৃথিবীর ভূষণ রাজা, মাঠের ভূষণ আম্পায়ার। রাজা ছাড়া রাজ্য চলে কিন্তু আম্পায়ার ছাড়া খেলা চলে না। আম্পায়ার-শূন্য মাঠ যেন আগুনশূন্য কাঠ। যেন পতিছাড়া কামিনী, শশী-ছাড়া যামিনী।

শেষের সুখই সুখ

'আর কী! এবার ওঠো।' ছুটি ওরফে ছুটকি জিনিসপত্র গুটোতে লাগল : 'লাস্ট ম্যান ইন।'

আমি বুঝি তবু কিছু গড়িমসি করছিলাম।

'চলো। মাঠ থেকে বেরুবার আগেই শুনতে পাবে পড়ে গেছে।' ছুটি আবার তাড়া দিল : 'সবাই উঠে পড়ছে। দেখতে-দেখতে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। বেরুতে আবার পরিশ্রম।'

'সুতরাং বসে যাও।' গম্ভীর মুখে বললাম, 'সবই শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত কী হয় কেউ বলতে পারে না।'

'খুব পারে। শেষ পর্যন্ত আউট হয়।' চোখে দাঁতে একসঙ্গে ঝিলিক মারল ছুটকুন।

'তবে কখন হয়? কতক্ষণে হয়?'

'এক্ষুনি হয়ে যাবে। তোমার ঐ এগারো নম্বরের লোকটা জীবনে কখনো রান করেছে?'

'বলা যায় না, হয়তো আজ করবে। অসম্ভবও যদি কোথাও ঘটতে পারে, তা এই ক্রিকেটে।' বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম : 'এই দেখ ওভারের মাথায় রান করে দশ নম্বর কেমন ক্রস করে চলে এল। ব্যাটের খেলাই যে সব সময়ে দেখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কখনো-কখনো বুদ্ধির খেলাও দেখতে হয়।'

'তোমার যে কী বুদ্ধি!' ছুটি রাগ করেই পাশে বসে পড়ল।

'বরং গুনগুনিয়ে একটা গান ধরো।'

'গান ধরব?' ঘাড় কাত করে গালে হাত রাখল ছুটি : 'এই সময়ে গান?'

'শেষ বেলাকার শেষের গানই তো এখন গাওয়া উচিত। কিংবা সেই গানটা—শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও বলে—' ফের উৎসাহিত হয়ে উঠলাম: 'দেখ দেখ এগারো নম্বর কেমন বল ঠেকাচ্ছে—ও মা, দেখ খুঁচ করে কেমন একটা রানও করে বসল।'

দেখি কতক্ষণ টেঁকে—এমনি এক মুনিস্মুলভ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল ছুটি। দেখি কতক্ষণ জলের তিলক কপালে থাকে। কতক্ষণ!

'অন্য সময়ে যা ডাল্ ক্রিকেট, শেষ সময়ে তাই দারুণ থ্রিলিং। ক্ষুধার্ত বাঘের মত সাত-সাতটা ফিল্ডসম্যান ব্যাটের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, মত্ত প্রভঞ্জনের মত বল, তার মধ্যে শুদ্ধ টিকে থাকাটাই কী প্রচণ্ড রোমাঞ্চ। বল যে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দিচ্ছে তাই কত বড় কৃতিত্ব আর যদি আস্তে মাটি ঘেঁসে ঠুকে দিতে পারছে তা হলে সে তো ঝঙ্কার। এক প্রসঙ্গে যে-রীতি অসহনীয় অন্য প্রসঙ্গে তাই আবার বলিহারি।'

চার-চারটে ওভার হয়ে গেল তবু দশে-এগারোতে বিচ্ছেদ ঘটানো গেল না।

'এ কী, আউট হয় না যে।' ছুটি ছটফট করে উঠল।

'সেই জন্যেই তো বলছি গান ধরো। অন্তত এখন সেই গানটা—রানের ধারা হল সারা, বাজে বিদায় সুব। ব্যাটেব পালা শেষ করে দে, শেষ কবে দে রে, যাবি অনেক দূর॥'

'এরা যে দেখছি জমে গেল।' হতাশের মত মুখ কবল ছুটকি।

'বলা যায় না কী হয়। লাস্ট উইকেটে উলি আর ফিল্ডার-এর মত ২৩৫ না করে বসে।'

'উঃ, রেকর্ড, কেবল রেকর্ড। আর শুনতে পারি না।' কানে আঙুল দিল ছুটি।

'লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপের রেকর্ড অবশ্যি ৩০৭—'

'বলো কী ?' শুনবে না বলেও না শুনে পারল না ছুটকুন ঃ 'তিন শো সাত ? কবে, কোথায়, কার কার মধ্যে ?'

'১৯২৮-২৯এ, কিপ্যাক্স আর হুকারের মধ্যে, মেলবোর্ণে। আচ্ছা বলো তো টেস্ট ম্যাচে রেকর্ড পার্টনারশিপ কত—যে কোনো উইকেটে, যে কোনো ইনিংসে, যে কোনো দেশে—মনে থাকে যেন, টেস্ট ম্যাচে—'

'জানিনা।' ছুটি লেপা উনুনের মত মুখ করলে।

'টেস্ট ম্যাচে রেকর্ড পার্টনারশিপ হচ্ছে ৪৫১—জুটি ব্র্যাডম্যান আর পন্সফোর্ড, সেকেণ্ড উইকেটে, ওভালে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৩৪এ—'

'কোন মাসে বললে না ?' ছুটি প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

'অগাস্ট মাসে। অগাস্ট মাসই তো মাস, সমস্ত ইতিহাসে উজ্জ্বলতম মাস।'

'এবার মাস নিয়ে পড়বে নাকি ?'

'পড়তেই হবে। মাসের কথা তুললে কেন ? অগাস্ট মাসেই আমাদের স্বাধীনতার জন্ম। অরবিন্দের জন্ম। নেপোলিয়নের জন্ম।'

'শুধু জন্ম ? মৃত্যু নেই ?'

'আছে। অগাস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ট্রটস্কির মৃত্যু।'

'শুধু এই ?'

'অগাস্ট মাসে আবার ধ্বংসলীলা। ১৯৪৫-এর ৬ই অগাস্ট হিরোসিমার উপব এটম বোম ফেলা হল তার তিন দিন পর ফেলা হল নাগাসাকির উপর। ঐ অগাস্টেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। আবার যদি কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হয় দেখবে ঐ অগাস্ট মাসেই।'

'হচ্ছিল লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপের কথা', ছুটকি তাড়া দিল ঃ 'এ যে দেখছি ছাই খুঁড়তে আগুন বেরুচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এই লাস্ট ম্যান-এর কথাই হোক। অভাবনীয় এই

লাস্ট ম্যান। যেমন যে রামের রাজা হবার কথা সে বনবাসে যায়, তেমনি যে রাখাল বনে ধেনু চরিয়ে বেড়ায় সে মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাজা হয়ে বসে।'

'গাইবার জন্যে কোকিল পুড়িয়ে খায় শুনেছি,' ছুটি টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'তুমি কেন রেকর্ড পুড়িয়ে খাচ্ছ?'

'খেলবার জন্যে।' সস্নেহে হাসলাম: 'আমিও তো খেলছি, খেলতে নেমেছি।'

'খেলতে নেমেছ! কোথায়?'

'তোমার জীবনে। তোমার জীবনে আমিই তো লাস্ট ম্যান ইন।'

'দেখ দেখ, এগারো নম্বরটা আবার একটা রান করল।' কথাটাকে সুন্দর কভার ড্রাইভ করলে ছুটি। বিরক্তি-বাঙা মুখে বললে, 'কী সর্বনাশ, লোকটা আউট হবে না নাকি?'

'না কি হ্যাম্পশায়ারের ওয়াজেল-এর মত ছু'ঘণ্টায় ৯ রান করবে। ঐ ৯ রানের দরুন ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে হার থেকে রক্ষা পেল। তখন কে বলবে ঐ ছু ঘণ্টায় ৯ রানটা ডাল্ ক্রিকেট।'

'কি আশ্চর্য, দশ নম্বরও যে পেটাচ্ছে!'

'এরা ১৯৪৬-এ সারের বিরুদ্ধে সারভাতে আর স্তুটে ব্যানার্জি না হয়ে ওঠে!'

'দেখ দেখ রান আউট হতে যাচ্ছিল—'

'হয়নি, হয়নি—' সমস্ত মাঠ উল্লাস করে উঠল।

'এক চুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছে।' উল্লাসে ছুটিও যোগ দিল: 'আউট হবি তো রান-আউট কেন?'

তার মানে ছুটিরও ভালো লাগছে।

'জানো, ১৯৬০-এর ব্রিসবেন টেস্টে তিন-তিনটে রান-আউট হয়ে গেল। আশি করে ডেভিডসন বিদায় নিল—সোয়া তিন ঘণ্টায় আশি রান। একটা শর্ট রান নিতে গিয়েই এই বিপদ। সাপের

উপর যেমন বেজি লাফিয়ে পড়ে তেমনি ছুটন্ত বলের উপর লাফিয়ে পড়ল সোলোমন। বলটা তুলে নিয়েই এমন তাক করে ছুঁড়ল যে স্টাম্প ছিটকে পড়ল। সাত গজ দূরে, আউট হয়ে গেল ডেভিডসন। সাত উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার তখন ২২৬। বেনোর সঙ্গে খেলতে এল গ্রাউট। আর সাতটা রান করতে পারলেই অস্ট্রেলিয়া জিতে যায়। খেলার বাকি আর ছ'মিনিট। অর্থাৎ ছ'মিনিটে সাত রান।'

'গ্রাউটও রান আউট হয়ে গেল তো?' ছুটি অসহিষ্ণুর মত বললে।

'তার আগে বেনো আউট হয়ে গেল, কট আলেকজাণ্ডার, বউলড হল্। ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াল শোনো। গ্রাউট যখন এল তখন সোবার্স বল দিচ্ছে। সোবার্সের সপ্তম বলে একটা রান করলে গ্রাউট। বেনোর ইচ্ছে ওভারের শেষ বলে সেও একটা সিঙ্গল নেয়, নিয়ে ওপারে গিয়ে হল্-এর মুখোমুখি হয়। গ্রাউটকে হল্-এর নিশ্চিত গ্রাস থেকে বাঁচায়। কিন্তু সোবার্সও ধুরন্ধর, শেষ বলে কিছুতেই বেনোকে সিঙ্গল নিতে দিল না। অগত্যা ওপারে গ্রাউটকেই হল্-এর সম্মুখীন হতে হল।'

'আর গ্রাউট এক বলেই আউট?'

'সেই শেষ ওভার। আট বলে ওভার। অস্ট্রেলিয়া আর ছ'রান করলে জেতে। আট বল ছয় রান। হাতে আরো তিন উইকেট।

'আর ঘড়িতে ক মিনিট?'

'চার মিনিট। অবিশ্যি সময়ের প্রশ্ন তখন অবান্তর। যেহেতু ওভার যখন আরেকটা হবে তখন সেটাকে সম্পূর্ণ করতেই হবে যদি না ইতিমধ্যে হেস্তনেস্ত হয়ে যায়।'

'তারপর?'

'ভাবো অবস্থাটা— আট বল, ছ'রান, তিন উইকেট। হল্-এর প্রথম বলটাই দুর্দান্ত বেগে গ্রাউটের কোমরে এসে লাগল। প্রচণ্ড ব্যথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল গ্রাউট, দেখল রানের জন্যে

বেনো এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রাউট ব্যথা ভুলে পড়ি-মরি করে ছুটল, পৌঁছে গেল ওপ্রান্তে। ফাঁকতালে আরেকটা রান হয়ে গেল। হকচকিয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভাবতেও পারেনি এমন কৌশলে বেনো একটা রান চুরি করে নেবে।'

'তা হলে তখন সাত বল, পাঁচ রান, তিন উইকেট।' ছুটি ঠিক অঙ্ক করেছে।

'হ্যাঁ, বেনোর অহঙ্কার হয়েছিল হল্-এর যোগ্য প্রত্যুত্তর সে নিজে, গ্রাউট নয়। কিন্তু মহাকাল হাসল। মহাকালের মতই বাউন্সার ছুঁড়ল হল্। কী প্রলোভনে ব্যাট তুলল বেনো, বলের স্পর্শ এড়াতে পারল না, ধরে ফেলল আলেকজাণ্ডার। বেনো ফিরে চলল। এল মেকিফ—ছ বল পাঁচ রান, দুই উইকেট।'

'মেকিফের তখন কী দশা! সামনে প্রচণ্ড কালানল হল্, তার বুকের ভিতরটা কী রকম করছিল নাজানি।' ছুটি হালকা মনে হাসল: 'ট্রুম্যানকে তো শুনেছি হল্-এর বলের আগে ক্রিজে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে নেয়।'

'হ্যাঁ, তেমন প্রার্থনার ছবি একটা দেখেছি বটে, কিন্তু মেকিফ যা করল তা ভাবনার অতীত। ব্যাটের ঠিক মাঝখান দিয়ে হল্-এর প্রথম বল ঠেকাল। দ্বিতীয় বলটা উইকেটের বাইরে বেরিয়ে যেতেই গ্রাউট ছুটল রান করতে। গ্রাউটকে আসতে দেখে মেকিফও ছুটল পাগলের মত। আলেকজাণ্ডার বল কুড়িয়ে মারল হল্-এর দিকে। হল্ বল কুড়িয়ে মারল স্ট্যাম্পের দিকে, লাগল না। তালেগোলে একটা রান হয়ে গেল।'

'তা হলে তখন চার বল, চার রান, দুই উইকেট।' ছুটি হাসল: 'এখনও তাহলে লাস্টম্যান আসেনি।'

'হল্-এর পঞ্চম বলটা চোখ-মুখ বুজে হাঁকড়াল গ্রাউট। একটা বাউণ্ডারি করবার ইচ্ছে কিন্তু লেগের দিকে ক্যাচ উঠে গেল। কানহাই বলের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ সিংহবিক্রান্ত হল্ তার

গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারুরই ক্যাচ ধরা হল না। এই ফাঁকে গ্রাউটের একটা রান হয়ে গেল।'

'তা হলে তিন বল, তিন রান, তুই উইকেট।' ছুটির অঙ্কে আর আতঙ্ক নেই।

'পরের বলে থাক-যাক করে মেকিফ মারলে এক চারের মার। সবাই ভাবলে বাউণ্ডারি হয়ে গেল বুঝি। কিন্তু না, বাঁচিয়ে দিলে। দু'রান শেষ করে তৃতীয় রান দিচ্ছে, সীমানার প্রায় রেখার উপর থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে উইকেট-কিপার আলেকজাণ্ডারের হাতে ছুঁড়ে মারল হান্ট। গ্রাউট মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েও রান-আউট বাঁচাতে পারল না। তৃতীয় রানটা নিতে পারলেই জিতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তা হবার নয়।'

'তারপরে এল কে?'

'এল ক্লাইন। এই লাস্টম্যান ইন। ভাবো একবার অবস্থাটা। দুটো বলে একটা রান। কী সে রুদ্ধ নিশ্বাস প্রতীক্ষা! একদিকে হল্, মূর্তিমান দুর্নিমিত্ত, অন্যদিকে ক্লাইন—জানেনা কোনটা তার হাত, কোনটা তার পা, কোনটা ব্যাট। তবু, জানো, হল্-এর সপ্তম বলটা ক্লাইন মেরে দিয়েই ছুটল রানের জন্যে। মেকিফও প্রস্তুত, সেও বেরিয়ে এল বুলেটের মত। বাঞ্ছিত রানটা হয়ে গেল বোধহয়। কিন্তু ওদের অন্তরালে আরো একজন ছুটেছে, সে সোলোমন, আর ছুটেই বলটা ধরে সরাসরি মেরে দিয়েছে স্ট্যাম্পে। আশ্চর্য, অসম্ভবেরও অসম্ভব, স্টাম্প ছিটকে গেল, রান-আউট মেকিফ। কী নিদারুণ আশা-নিরাশার খেলা, উত্তাপের কী উত্থান-পতন, আর কী অভাবনীয় সমাপ্তি! রানে-রানে সমান সমান।'

'কিন্তু আমাদের এদের কী গতি হবে?' ছুটি তাকাল মাঠের দিকে: 'এরা যে নড়েও না, সরেও না।'

'এরা শুধু সময় কাটায়। কখনো-কখনো চুপচাপ সময়-কাটানোও ক্রিকেট। যেমন আমরা কাটাচ্ছি।'

'তার মানে আমরাও ক্রিকেট খেলছি।' খেলা-শেষ আকাশের বাকি রোদের সমস্তটুকুই যেন ঝলসে উঠল ছুটির চোখে।

'জীবনই তো ক্রিকেট—ক্রিকেট না খেলে উপায় কী! কিন্তু ১৯৬১-র ফোর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার লাস্ট উইকেট পার্টনারশিপ ১০৯ মিনিট ধরে টিকল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জিততে দেওয়া হবে না কিছুতেই, অন্তত ড্র করতে হবে—এই সংকল্প নিয়েই খেলছে অস্ট্রেলিয়া। সেবারও লাস্ট ম্যান ক্লাইন, খেলতে এল ম্যাকের সঙ্গে। স্লো খেলে, পাথুরে-দেওয়াল ব্যাটিং করে বলে ম্যাকের বদনাম, কিন্তু সেদিন সে দেখিয়ে দিল বিকারহীন নিশ্চেতন খেলার মধ্যেও কত পৌরুষ। ছ'টা বাজতে এক মিনিট বাকি, ক্যাপটেন ওরেল শেষ ওভার বল দিতে হল্‌কে ডাকলে। যেমন ম্যাকের আরেক নাম 'স্ল্যাশার' তেমনি হল্-এর আরেক নাম 'ক্ল'। হল্ কী করবে যদি ম্যাকে ব্যাট দিয়ে বলে না ঠোকর মারে? তাই হল, পাথুরে-দেয়াল ম্যাকে এতটুকুও প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত হল না, প্রয়োজনমত বল ছেড়ে দিতে লাগল। ক্ষিপ্তের মত হয়ে গেল হল্, শেষ বল, অষ্টম বল নো-বল করে দিল। নো-বলের ডাকটা বুঝি কেউ স্পষ্ট করে শোনেনি, বোধহয় ম্যাকেও নয়, ড্র ভেবে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ল সকলে। না, আরো এক বল আছে, আর সেই শেষ বল।'

'কী হল? আউট হয়ে গেল ম্যাকে?'

'শোনোই না কী হল। শেষের সে দিনের মতই ভয়ঙ্কর বল। গা-সই দুর্দান্ত বল, হয় ব্যাট দিয়ে ঠেকাও নয়তো বুক পেতে গ্রহণ করো। ম্যাকে জানে ব্যাট দিয়ে ঠেকাতে গেলেই নির্ঘাৎ ক্যাচ উঠবে, যা ধরবার জন্যে সাত-সাতটা লোক থাবা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই সে সে-বল শান্ত মনে নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবে বুক দিয়ে গ্রহণ করলে। বুকের কখানা পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কে খবর রাখে, ম্যাকে আউট হয়নি, ব্যাটশুদ্ধু হাত মাথার উপর

তুলে ধরে তার দেশকে, অস্ট্রেলিয়াকে মাথার উপর তুলে দিয়েছে। দেশের জন্যে মার খেতে দিয়েছে বুক পেতে। কত বড় সুখ বলো তো।'

'এও একটা রেকর্ড।'

'নিশ্চয়। রেকর্ড যেমন রানে তেমনি আবার শূন্যে।'

'শূন্যে ?'

'হ্যাঁ, এইখানে ক্রিকেট জীবনের চেয়ে বড়। জীবনের যে শূন্য যে ব্যর্থ তার নাম লেখা থাকে না, কিন্তু ক্রিকেটে যে শূন্য ও ব্যর্থ তার নামও লেখা থাকে। টেস্ট ম্যাচে সবচেয়ে বেশি শূন্য করেছে কে ? ইংল্যাণ্ডের ইভান্স ৯১টা ম্যাচে ১৯টা শূন্য। কে কে 'পেয়ার' করেছে জানো ? 'পেয়ার' বোঝ তো ?'

'মানে –সাহেব-বিবি নিশ্চয়ই নয়।' ছুটি মুচকে হাসল।

'না, দু ইনিংসেই শূন্য করাকে পেয়ার বলে। এমন গুণধরও আছে যারা প্রথম টেস্টেই পেয়ার করেছে। ইংল্যাণ্ডের জি, এফ, গ্রেস, ভারতের রামচাঁদ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভ্যালেন্টাইন, নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাডকক, সাউথ আফ্রিকার জোন্স, লুইস, ম্যাককার্থি। টেস্ট ম্যাচে ক্যাপটেন হয়ে পেয়ার করেছে অস্ট্রেলিয়ার ডার্লিং আর বেনো, আমাদের হাজারে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল আর পাকিস্তানের ইমতিয়াজ।'

'কিন্তু আমাদের—আমার-তোমার স্কোর কত ?' ছুটির কণ্ঠে বা একটু ব্যাকুলতার সুর।

'আমাদের পেয়ার হবে না -

'হবে না মানে ?'

'মানে দু ইনিংসেই আমরা শূন্য করব।'

'দু ইনিংস !'

'হ্যাঁ, ভালোবাসা প্রথম ইনিংস—দ্বিতীয় ইনিংস সংসার। প্রথম ইনিংসে আমাদের কিছু রান হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।'

'তা কেন বলছ?' ছুটি এবার তার চোখের কালোকে গভীর করে তুলল। বললে, 'দেখলে না আমাদের শেষ জুটি কেমন টিকে রইল শেষ পর্যন্ত। ওরা তো সুখী হলই, সকলে সুখী হল। শেষের সুখই সুখ।'

'অশেষ আরো বেশি। ওরা একদিন আউট হবে। কিন্তু আমরা?'

কী আমরা?'

'আমরা কোনোদিন আউট হব না। আমরা ছুটি পাব।'

ক্রিকেট

একাসনে যোগারূঢ় কিছুক্ষণ হয়ে থাকি স্থির,
চক্ষুরে শিক্ষিত করি আগ্রহেরে একাগ্র নিবিড়,
তারপরে দুর্বার দুর্জয় ব্যাটে তুলে দেব মার—
ঝাঁজালো সবুজ রোদে মাঠময় প্রাণের ঝঙ্কার,
বাহুর বিস্তারে বীর্যে দুঃসাহসী দৃপ্ত উচ্চারণে
রানে-রানে হয়রান, গাব গান নিঃশঙ্ক মরণে,
দিকে-দিকে ছোটাব রকেট
খেলে যাব খেলে যাব মুখর ক্রিকেট ॥

কালস্রোতে কোনোক্ষণে করতেই হবে কোনো ভুল,
আম্পায়ার তুলে দেবে নির্বিকার নিষ্ঠুর আঙুল।
নিয়তিরে মেনে নেব, রাখব না কোনো অভিমান,
সুখে-দুঃখে উদাসীন, গুনব না কত মোট রান—
খেলা শেষ হল যদি, প্যাভিলনে চলে যাব ফিরে
মৃত্যুর মার্জনা নিয়ে বিস্মৃতির শূন্যের তিমিরে,
করব না কভু মাথা হেঁট
খেলে যাব খেলে যাব রঙিন ক্রিকেট ॥

তারপরে ডাকো যদি করে যাব ক্লান্তিহীন বল্‌,
দেখাব প্রত্যেক ক্ষেপে কাকে বলে দুরাত্মার ছল,

তীক্ষ্ণ বক্র শ্লথ মৃদু—দৃঢ়মুষ্টে কত ঘোরপ্যাঁচ—
কিন্তু হায় সতীর্থেরা ফেলে দেবে কত সোজা ক্যাচ,
ছেড়ে দেবে বাউণ্ডারি, বোর্ড হবে কালো হতে কালো,
তবু জানি ব্যর্থ নই জ্বেলে যাব আশ্চর্যের আলো,
এ্যাভারেজ থাক ক্লিন শ্লেট
খেলে যাব খেলে যাব নিখুঁত ক্রিকেট ॥